সুনীতি-বিকাশ।

প্রথম ভাগ।

(শিক্ষাবিভাগের মাননীয় ডিরেক্টর মহোদয়ের নির্দ্ধারিত
নিয়মানুসারে পঞ্চম মানের জন্য রচিত।)

'অঞ্জলি', 'ধ্যানলোক', 'তপোবন', 'প্রহ্লাদ-উপাখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহায়ক-সদস্য,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের পরীক্ষক,

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত।

"সাধনাকুঞ্জ", ঘাটফরাদ বেগ, চট্টগ্রাম হইতে শ্রীস্বর্ণকুমার দত্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য পাঁচ আনা।

সুনীতি-বিকাশ

প্রথম ভাগ।

(শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে
পঞ্চম মানের জন্য রচিত।)
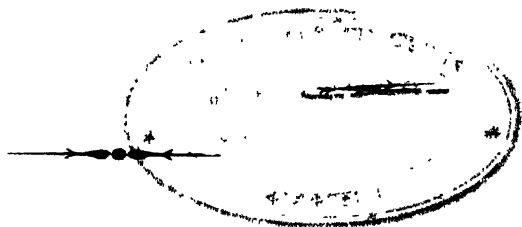
'অঞ্জলি', 'ধ্যানলোক', 'তপোবন', 'প্রহ্লাদ-উপাখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহায়ক-সদস্য,

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত।

"সাধনাকুঞ্জ", ঘাটফরাদ বেগ, চট্টগ্রাম হইতে শ্রীস্বর্ণকুমার দত্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য পাঁচ আনা।

নিবেদন।

সকল নীতির মধ্যে ধর্ম্ম-নীতি শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম-হীন শিক্ষা, শিক্ষা-পদ-বাচ্য হইতে পারে না। ধর্ম্মই এদেশের জীবন।

এই ধর্ম্মকেই মূল ভিত্তি করিয়া "সুনীতি-বিকাশ" রচিত হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য কোন বিশেষ ধর্ম্ম-মত অবলম্বন করি নাই; আমি শুধু শিক্ষাবিভাগের মাননীয় ডিরেক্টর মহোদয়ের নির্দ্ধারিত অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বজনীন নিয়মাবলীর সর্ব্বথা অনুসরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

যদিও এই নিয়মাবলীতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কোথায়ও কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশ নাই, তথাপি আমি তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। কেননা, বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ ও মৈত্রীর ধর্ম্ম এবং ইহা এখনও জগতের এক বিশাল স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে বালকদিগের কিছু জ্ঞান থাকা উচিত।

ফলতঃ, "সুনীতি-বিকাশ" হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী বালকগণের সমান উপযোগী করিয়া রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এতদর্থে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই উন্নত আদর্শ ও মহৎ ঘটনাবলী সন্নিবেশ করা গিয়াছে। ভরসা করি, ইহাতে বালকেরা যেমন আপনাপন সমাজের পুণ্য কথা জানিতে সুযোগ পাইবে, তেমনি তাহারা পরস্পরকে ভাল করিয়া চিনিতে, ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে।

কেবল মাত্র শুষ্ক উপদেশ অপেক্ষা সদুপদেশপূর্ণ গল্প বা কাহিনীতে সুকুমারমতি বালকদের চিত্ত বেশী আকর্ষণ করে এবং তাহা তাহাদের পক্ষে সমধিক সুফলপ্রসূ হয়। এজন্য আমি "সুনীতি-বিকাশের" উপদেশ বিভিন্ন সমাজের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গল্পে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বালকবালিকাদের নিমিত্ত প্রকাশিত "মুকুল" নামক মাসিক পত্র হইতে "ধূলার আশ্চর্য্য কাজ" শীর্ষক প্রবন্ধটী সঙ্কলন করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত "সুনীতি-বিকাশ" প্রণয়নে আমি আরও কয়েক খানি পুস্তকের কিছু কিছু সাহায্য লইয়াছি। এজন্য আমি লেথক ও গ্রন্থকারের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

"ধ্রুবের ব্যাকুলতা" শীর্ষক কবিতাটী আমার পরম পূজ্যপাদ পিতৃ-দেবের বাল্যকালে রচিত "ধ্রুবের সাধনোপাথ্যান" নামক পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

পক্ষান্তরে, "সুনীতি-বিকাশ" প্রকাশে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র, বি, এল, মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে নানা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার নাম উল্লেথ করিতেছি।

পরিশেষে নিবেদন, যাহাদের জন্য সুনীতি বিকাশ রচিত ও প্রকাশিত হইল, ইহা তাহাদের সুকোমল অন্তরে সুনীতি বিকাশের কিছুমাত্র সাহায্য করিলে, আমার সকল যত্ন ও শ্রম সার্থক হইবে।

বৈশাখী পূর্ণিমা
১৩২২
"সাধনাকুঞ্জ", চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র।

গদ্যাংশ।

পদ্যাংশ।

বিষয়				পৃষ্ঠা

সুনীতি-বিকাশ।

প্রথম ভাগ।

(গদ্যাংশ।)

বুদ্ধদেব।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী কপিলাবস্তু নগরে মহারাজ শুদ্ধোদন নামক একজন শাক্যবংশীয় নৃপতি রাজত্ব করিতেন। রাজা যেমন ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজাবৎসল, তাঁহার দুই রাণী মহামায়া ও প্রজাবতী দেবীও তেমনি পুণ্যশীলা ও দয়াবতী ছিলেন। এমন মধুর-প্রকৃতি রাজারাণীর আশ্রয়াধীনে থাকিয়া নগরবাসীগণ পরম সুখে ও শান্তিতে বসবাস করিতেন।

সকলের মনে শুধু এক দুঃখ, রাজা ও রাণীর কোন পুত্র-কন্যা নাই। রাজদম্পতিও এজন্য সর্ব্বদা ম্রিয়মান থাকিতেন। এ ভাবে কিছুকাল গত হইল।

অবশেষে একদিন পরম শুভক্ষণে রাজা প্রজা সকলেরই প্রাণের আকুল প্রার্থনা করুণাময় পরমেশ্বরের নিকটে পৌঁছিল —মহারাণী মহামায়া পবিত্র বাসন্তীপূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনী

উদ্যানে পূর্ণশশধরের মত এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। সমগ্র কপিলাবস্তু অপরিসীম মঙ্গলোৎসবে সজীব ও মুখরিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু একটী সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতেই এ গভীর আনন্দোচ্ছ্বাসকে বিষাদ-করুণ করিয়া অকস্মাৎ মহারাণী মহামায়া লোকান্তরিতা হইলেন! মাতৃহারা ক্ষুদ্র শিশুটীকে মহারাণী প্রজাপতি দেবী জননীর ন্যায় অতুলনীয় স্নেহে আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন।

যথাসময়ে মহাসমারোহে নবজাত রাজকুমারের নামকরণ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। তাঁহার জন্মে সকলের মনস্কামনা সার্থক হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ রাখা হইল। এ সময়ে কয়েকজন দৈবজ্ঞ মহারাজ শুদ্ধোদনকে বলিলেন, কুমার যদি গৃহাশ্রমী হয়েন, তবে রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন, আর যদি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, তবে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

সকলের আদর যত্ন ও সোহাগের মধ্যে সিদ্ধার্থ লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যথাকালে শুভ লগ্নে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইল। তিনি যেমন অনন্যসাধারণ মেধাবী, তেমনি ধীর ও প্রশান্ত প্রকৃতির বালক ছিলেন। বালকসুলভ কোন প্রকার চপলতা তাঁহাতে কখনও দেখা যাইত না।

রাজকুমার সিদ্ধার্থের বয়স ও জ্ঞান ক্রমে যত বাড়িতে লাগিল, তিনি ততই গম্ভীর ও চিন্তাশীল হইতে লাগিলেন। রাজধানীর উদ্বেলিত কোলাহল অপেক্ষা নিভৃত পল্লীর স্নিগ্ধ

সৌন্দর্য্য তাঁহাকে সমধিক আকর্ষণ করিত। ক্ষুদ্র পুষ্পকলিটী যেমন সুবাসে ও সুষমায় ধীরে ধীরে পূর্ণ হইয়া উঠে, বালক সিদ্ধার্থের ক্ষুদ্র হৃদয়খানিও বুঝি তেমনি লোকচক্ষুর অগোচরে অপার্থিব প্রেমে ও করুণায় পরিপূর্ণ ও বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল।

এ সময়ের একটি ঘটনায় ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলা সিদ্ধার্থ ফুলের বনে বসিয়া আপন মনে কি ভাবিতেছিলেন। উন্মুক্ত আকাশপথে কত দেশের কত পাখী সুমধুর কল-কণ্ঠে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া দলে দলে আপনাপন কুলায়ে ফিরিতেছিল। অকস্মাৎ সিদ্ধার্থের পিতৃব্য-তনয় দেবদত্ত অব্যর্থ শরসন্ধানে একটী নীড়-যাত্রী রাজহংসকে বিদ্ধ করিল। হতভাগ্য পাখীটী রক্তাক্ত-দেহে সিদ্ধার্থের অদূরে পতিত হইয়া যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কোমল-প্রাণ সিদ্ধার্থ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনি ছুটিয়া গিয়া আহত পাখীটীকে সযত্নে কোলে তুলিয়া লইলেন।

আশৈশব-সুখী রাজকুমার দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না। তাই আহত পাখীটী কিরূপ বেদনা পাইয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য তাহার শরীর হইতে শরটী তুলিয়া লইয়া সজোরে আপনার কোমল অঙ্গে আঘাত করিলেন এবং নিজে দারুণ ব্যথা পাইয়া রাজহংসের বেদনার কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। যাহা হউক, সিদ্ধার্থের অক্লান্ত-শুশ্রূষায় আহত রাজহংসের প্রাণ রক্ষা পাইল। পাখীটী একটু সবল হইয়া উঠিলেই তিনি তাহাকে আবার অনন্ত গগনে উড়াইয়া দিলেন।

কিন্তু এই ঘটনায় দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ বাণী স্মরণ করিয়া মহারাজ শুদ্ধোদন বিশেষ চিন্তিত ও শঙ্কিত হইলেন। যে একটী সামান্য প্রাণীর শারীরিক কষ্ট হইলে সহ্য করিতে পারে না, সে কি প্রকারে বিশাল জগতের অনন্ত দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া তুচ্ছ সুখের আশায় সাংসারিক মায়ায় আবদ্ধ হইবে?

মন্ত্রীগণ রাজাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "মহারাজ! চিন্তা কি? আমরা তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

মানুষের বুদ্ধিতে ও চেষ্টায় আমোদ প্রমোদের যত রকম সম্ভব, তৎসমস্তই রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্য রাজপুরীতে সংগৃহীত হইল। কেবল নৃত্য, গীত, আনন্দ উৎসবের ভিতরে রাজকুমারকে ভুলাইয়া ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। যাহাতে পৃথিবীর কোনরূপ দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক, জরামৃত্যু এ উৎসব-ভবনের ত্রিসীমায় আসিতে না পারে, তাহার জন্য কঠোর রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল।

মহারাজ শুদ্ধোদনের ইচ্ছায় কুমার সিদ্ধার্থ ঊনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গোপা নাম্নী এক অতি রূপবতী ও গুণবতী শাক্যকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে তাঁহার একটী সুকুমার শিশুও জন্মগ্রহণ করিল। রাজা এই ভাবিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন যে সিদ্ধার্থ কখনও এই সকল স্নেহ-ডোর ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না।

কিন্তু বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান কে খণ্ডন করিবে? তিনি যাহাকে যে কাজের জন্য এ পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন,

অদূরদর্শী মানবের কি সাধ্য তাহাকে তাহা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারে ?

একদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থ উদ্যান ভ্রমণ করিতে যাইয়া একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পথিপার্শ্বে রোগাতুর, জরাজীর্ণ ও মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার অন্তরের সুপ্ত বৈরাগ্য ভাব আবার জাগরিত হইল। তিনি সংসারের অনিত্যতা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার উদার প্রাণ জগতের সমবেদনায় জাগিয়া উঠিল। তিনি আর রাজসুখে ভুলিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই সমুদয় দুরতিক্রম সন্তাপ হইতে যাহাতে বিশ্ববাসী মানব সমাজ রক্ষা পাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য রাজকুমার সিদ্ধার্থ গভীর নিশীথে রাজ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। জগতের হিত-কামনায় রাজকুমার পথের ভিখারী সাজিলেন। কোন প্রকার স্নেহের আকর্ষণ কিংবা ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন তাঁহাকে আর সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না।

এমন গুণবান রাজকুমারকে এ ভাবে হারাইয়া রাজপুরীর ও রাজধানীর কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা আর বিশেষ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। এ দিকে সিদ্ধার্থ তাঁহার রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে দুষ্কর তপস্যায় এই মহাসত্য জ্ঞানে উপনীত হইলেন যে, মানুষ অজ্ঞানতা, পাপ ও পার্থিব তৃষ্ণা বিসর্জ্জন করিতে পারিলে পৃথিবীর সকল দুঃখ ও যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। জীবের এই পরম অমৃত অবস্থার নাম নির্ব্বাণ।

সিদ্ধার্থ এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া জগতের নিকটে বুদ্ধদেব নামে পরিচিত ও অভিনন্দিত হইলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার অমিতাভ, গৌতম, শাক্যসিংহ প্রভৃতি আরও কয়েকটি নাম আছে।

করুণাময় বুদ্ধদেব নিজে যে নিগূঢ় সত্যের ও শান্তি-সম্পদের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা জগতের ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে সমভাবে বিতরণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান বারাণসীর সন্নিকটস্থ সারনাথ নামক স্থানে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথম তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিলেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম শিষ্যের নাম কোণ্ডাণ্য।

তিন মাসের মধ্যে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা ষাট জন হইলে তিনি এই সমুদয় শিষ্যকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহার সাধনালব্ধ অভিনব ধর্ম্ম প্রচার করিতে পাঠাইলেন এবং নিজেও দ্বারে দ্বারে এই অভয় বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধদেব প্রচারিত ধর্ম্মে উচ্চনীচের ভেদাভেদ নাই; এবং জীবে দয়া এই ধর্ম্মে একটী সার কথা। তাঁহার পুণ্য-চরিত্র-প্রভাবে ও সুমধুর উপদেশে দলে দলে লোক নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কত লোক বুদ্ধদেবের ন্যায় ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিলেন। বুদ্ধদেবের চরণপ্রান্তে নির্ব্বাণের আশায় রাজা প্রজা সকলেই সমভাবে একপ্রাণে সম্মিলিত হইলেন। এরূপে বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম "বৌদ্ধধর্ম্ম" এবং এ ধর্ম্মে যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা "বৌদ্ধ" বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিল।

এদিকে মহারাজ শুদ্ধোদন তাঁহার পুত্র সিদ্ধার্থের সিদ্ধি ও কীর্ত্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বুদ্ধদেব বৃদ্ধ মহারাজের অনুরোধে কপিলা-বস্তুতে সশিষ্য উপস্থিত হইয়া তাঁহার নৈমিত্তিক অভ্যাসমত ভিক্ষাছলে নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে নির্ব্বাণের অভয় বার্ত্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের এ ভিখারীর বেশ দেখিয়া কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না।

মহারাজ এ সংবাদ পাইয়া বুদ্ধদেবকে রাজপুরীতে লইয়া গেলেন। তাঁহার তখনকার সেই সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার সেই সুধামাখা উপদেশ শুনিয়া সকলে নবধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করিলেন।

রাজ-বধূ গোপা তাঁহার একাদশ বর্ষীয় পুত্র রাহুলকে পৈত্রিক সম্পদ ভিক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধদেবের নিকটে পাঠাইলেন। বুদ্ধদেব তাঁহার একমাত্র সন্তানকে ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা দিলেন। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী পিতা সন্ন্যাস ব্যতীত আপন পুত্রের জন্য আর কি শ্রেষ্ঠ রত্ন নির্ব্বাচন করিবেন?

মহারাজ শুদ্ধোদন বৃদ্ধবয়সের শেষ সম্বলটুকুও হারাইয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কপিলাবস্তু পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয় নিশান প্রোথিত হইল। বুদ্ধদেব সানন্দে দেখিলেন, নিত্য সহস্র সহস্র মুক্তিকামী নরনারী সেই অপূর্ব্ব বিজয় নিশানের শীতল ছায়ায় সমবেত হইতেছে। এই বিরাট সাফল্যের ও

শান্তির বার্ত্তা প্রাণে লইয়া মহান্-হৃদয় বুদ্ধদেব কুশীনগরের শালবনে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মহানির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

আজ জগতের এক তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। বুদ্ধদেবের অসাধারণ আত্ম-ত্যাগ তাঁহাকে মানবের হৃদয়রাজ্যে অমর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যিনি তাঁহার ন্যায় নিজের ক্ষুদ্র সুখ, সুবিধা ও স্বার্থ ভুলিয়া বিশাল জগতের কল্যাণ কামনায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারেন, তিনি যথার্থ বিশ্বপ্রেমিক। যখন যে দেশে এইরূপ মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, তখন সে দেশ ও সে দেশবাসী তাঁহার পবিত্র সংস্রবে ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া থাকে। আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে একদিন এমনি একজন আত্ম-ত্যাগী বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর।

"বিদ্যাসাগর" উপাধি আমাদের দেশে অনেকে লাভ করিয়াছেন, কিন্তু "বিদ্যাসাগর" বলিতে আমরা একমাত্র দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রকেই বুঝিয়া থাকি, তাঁহারই প্রাতঃস্মরণীয় নাম সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের মনে পড়ে।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ নামক গ্রামে ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সামান্য বেতনে

কলিকাতায় চাকরী করিতেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখিলে পর নয় বৎসর বয়সের সময় ঠাকুরদাস তাঁহাকে স্বীয় কার্য্যস্থল কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন।

ঠাকুরদাসের এরূপ আর্থিক অবস্থা ছিল না যে, তিনি দাসদাসী রাখেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে নিত্য নিজের হাতে গৃহের সমস্ত কাজ করিয়া বহুদূরে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতে হইত। কিছুকাল পরে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা কলিকাতায় আসিলে তাহারও সেবা ও যত্নের ভার বালক ঈশ্বরচন্দ্রের উপরে অর্পিত হইল। এ সকল কারণে তিনি যথাসময়ে লেখাপড়া করিবার অবসর পাইতেন না, রাত্রি জাগিয়া তাঁহাকে পাঠাভ্যাস করিতে হইত। কিন্তু রাতদিনের এই কঠোর পরিশ্রম কিছুতেই ঈশ্বরচন্দ্রকে বিচলিত বা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিত না। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালকরূপে পরিচিত হইলেন।

শুধু ইহাই নহে। মানুষ যে অবস্থায় নিজেই দয়ার পাত্র, সে অবস্থাতে থাকিয়াও ঈশ্বরচন্দ্র অন্যের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া সুখী হইতেন। তিনি বিদ্যালয়ে যে 'জলপানি' বা মাসিক বৃত্তি পাইতেন, তাহার অধিকাংশই দরিদ্র ছাত্রদিগকে দান করিতেন। কখনও কখনও এমনও হইত, যখন তাঁহার নিজের একখানা ব্যতীত আর পরিধেয় বস্ত্র নাই, তখন সে

কাপড়খানিও অপরকে বিতরণ করিয়া তিনি আপনি গামছা পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেন। যাহার অনেক আছে, অন্যকে দান করা তাহার পক্ষে কষ্টকর নয়, বরং তাহার দান না করাই লজ্জার ও নিন্দার বিষয়; কিন্তু যাহার নিজের কিছুই নাই, তাহার এরূপ দান করা যেমন বিচিত্র, তেমনি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও গভীর উদারতার পরিচায়ক। বালক ঈশ্বরচন্দ্রে এমনি অসাধারণ মহত্ত্ব ছিল।

সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন। ইহার পর তিনি কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়েন।

ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া কলেজের একটী প্রচলিত সঙ্কীর্ণ নিয়মের সংস্কার সাধন করেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির কোন ছাত্রেরই সংস্কৃত কলেজে পাঠ করিবার অধিকার ছিল না, উদারচেতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় সকল জাতির ছাত্রের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা সত্বেও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলি, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর এই চারিটী জেলার স্কুল সমূহের অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর বা পরিদর্শকের কার্য্যে ব্রত হয়েন। এ স্থযোগে তিনি দেশের নানাস্থানে নূতন নূতন

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া দেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কেবল বালকদের বিদ্যাশিক্ষার কথা চিন্তা করিতেন তাহা নহে, তিনি এ সময়ে মহাত্মা বেথুন সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশাল হৃদয় কখনও কাহারও কল্যাণ সাধনে বিস্মৃত হইত না।

আজ ছাত্রসমাজ যে সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ উপভোগ করে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারও প্রবর্ত্তক। আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজরাজের শীতপ্রধান দেশোপযোগী শীতের ছুটি প্রচলিত হইয়াছিল। দয়ালু বিদ্যা-সাগর মহাশয় আমাদের দেশের গ্রীষ্মকাতর ছাত্রদিগের দুঃখে ব্যথিত হইয়া শীতের ছুটির পরিবর্ত্তে আমাদের গ্রীষ্ম-প্রধান দেশোপযোগী গ্রীষ্মের ছুটি প্রবর্ত্তন করেন।

কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতভেদ হওয়ায় তিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করেন। এ সময়ে তিনি পাঁচ শত টাকা বেতন পাইতেন। কিন্তু অর্থের জন্য বিদ্যাসাগর কখনও আত্মসম্মান বিক্রয় করেন নাই। তাঁহার এই আত্মসম্মান রক্ষার উপযুক্ত যথেষ্ট আত্মনির্ভরতাও ছিল। ফলে তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়নে মনোযোগী হয়েন এবং তদ্দ্বারা প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিতে থাকেন।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থ কখনও শুধু নিজের সুখ

ও সুবিধার জন্য ব্যয়িত হইত না। তিনি স্বয়ং অত্যন্ত মিতাচারী ছিলেন, সামান্য অন্নবস্ত্রে পরিতুষ্ট থাকিতেন। তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই তিনি বহু দরিদ্র ছাত্র ও দুঃস্থ পরিবারবর্গকে নিয়মিতরূপে মুক্তহস্তে দান করিতেন। তাঁহার দয়া কখনও উচ্চনীচ ভেদাভেদ বিচার করিত না; জগতে যাহাকে সকলে ঘৃণা করে, সেও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়া লাভে বঞ্চিত হইত না। যে দরিদ্র, যে পীড়িত, যে ব্যথিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদার হৃদয়খানি যেমন তাহাদের কষ্ট লাঘবের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল ও প্রস্তুত ছিল, তেমনি তাঁহার গৃহখানিও সর্ব্বদা তাহাদিগের আশ্রয়ভবন স্বরূপ ছিল। কেহ কখনও তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। এই অসাধারণ সহৃদয়তার নিমিত্তই বিদ্যাসাগর মহাশয় "মহারাজ" উপাধি অপেক্ষাও গৌরবাত্মক "দয়ার সাগর" উপাধিতে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের পূজাঞ্জলি লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অতুলনীয় দয়াপ্রবণতার মূলে আমরা তাঁহার জননী ভগবতী দেবীকে দেখিতে পাই। তিনি নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণমহিলা হইয়াও অসামান্য হৃদয়বতী রমণী ছিলেন। তাঁহার অকুণ্ঠিত দয়া সর্ব্বদা বিপন্নের প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিত। রোগার্ত্তের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বস্ত্রহীনের লজ্জা নিবারণ এবং শোকাতুরের কষ্টে সমবেদনা প্রকাশ তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। তিনি যেন সমগ্র বীরসিংহ গ্রামের দুঃখ-সন্তাপনাশিনী অন্নপূর্ণা স্বরূপা জননী ছিলেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার মাতৃদেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

বৎসরান্তে একবার সমারোহে দুর্গোৎসব করিয়া ছয় সাত শত টাকা ব্যয় করা ভাল, কি গ্রামের অসহায় দরিদ্রদিগকে ঐ টাকা দিয়া প্রতি মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভাল? উত্তরে দীন-জননী ভগবতী দেবী বলিয়াছিলেন, "গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রতিদিন খাইতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।" যিনি এ ভাবে দেব-পূজা অপেক্ষা দীন-সেবাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে পারেন, তাঁহার হৃদয়খানি যে কত উন্নত ও পরদুঃখকাতর ছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। এমন জননীর সন্তান হইয়াই বিদ্যা-সাগর এ স্বার্থপর সংসারে দয়ার সাগর হইতে পারিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার কোমলপ্রাণা মাতৃদেবীর প্ররো-চনায় এবং পিতৃদেবের আদেশে হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া বাল-বিধবার পুনর্ব্বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তাহা প্রমাণ করেন এবং বিরুদ্ধবাদীগণের সকল প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া ১২৬৬ সাল হইতে ১২৭২ সাল পর্য্যন্ত অজস্র অর্থব্যয়ে বহুতর বালবিধবার হিন্দুমতে পুনর্ব্বিবাহ প্রদান করেন। এ সমাজ সংস্কারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল; এমন কি, সময়ে সময়ে তাঁহার জীবননাশের আশঙ্কাও ঘটিয়া-ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা ন্যায় ও কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন, তাহা হইতে কদাচ বিচলিত হইবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার দেব-চরিত্রে কুসুম-কোমলতার সহিত বজ্র-কঠোর অমিত তেজঃ বর্ত্তমান ছিল। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণচন্দ্রেরও বিধবা বালিকার সঙ্গে পরিণয় দিয়া স্বীয় বাক্য ও কার্য্যের সমতা প্রদর্শন করেন। পাছে এই সকল পরিবারকে কেহ

ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এজন্য বিদ্যাসাগরের মহীয়সী মাতৃদেবী ইঁহাদের সহিত একত্রে আহারাদি করিতেও কখন কুণ্ঠিতা হইতেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জনক জননীকে প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন এবং তদ্রূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। একবার তিনি কাশীর কতকগুলি অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃদেবতাই সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর এবং মাতৃদেবীই সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। তিনি এই প্রত্যক্ষ বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা ব্যতীত আর কাহাকেও মানেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ কথাগুলির ভিতরে কি গভীর ও অকপট পিতৃমাতৃভক্তি প্রকাশ পাইতেছে!

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপোলিটান্ ইনষ্টিট্যুশন নামক কলেজ স্থাপন করেন। ইতিপূর্ব্বে আর আমাদের দেশে বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টায় ও নিজের অধীনে উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষাদানের কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়েও প্রথম পথপ্রদর্শক। এই কলেজটীর জন্যও তাঁহাকে অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। বহু বাধাপ্রতিবন্ধকতা উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি ইহার স্থায়িত্ব বিধান করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় আহারবিহারে সাতিশয় মিতাচারী হইলেও একটী বিষয়ে তাঁহার কিছু বিচিত্র সৌখীনতা ছিল। তিনি তাঁহার নিজের ব্যবহার্য্য মূল্যবান পুস্তকগুলি বহু অর্থব্যয়ে বিলাত হইতে বাঁধাইয়া আনিতেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব

পুস্তকাগারটী বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে" পরিরক্ষিত হইতেছে।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে লোকান্তরিত হয়েন। তিনি বঙ্গদেশের একজন প্রকৃত সুসন্তান ছিলেন। তাঁহার উন্নত কর্ম্মময় জীবন জগতের যে কোনও সুসভ্যজাতির উচ্চ আদর্শরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

মহাত্মা ফজিল আয়াজ।

প্রায় দ্বাদশ শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ফজিল আয়াজ আরব দেশস্থ মার্ব্ব ও মারুতের প্রান্তরে বস্ত্রবাস স্থাপন করিয়া বাস করিতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক অনুচর ছিল। ইহারা নানা-স্থানে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার ফজিল আয়াজের নিকট লইয়া আসিত; তিনি স্বহস্তে সকলকে তাহা বিভাগ করিয়া দিতেন এবং আপন ইচ্ছামত স্বয়ং একভাগ গ্রহণ করিতেন।

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ফজিল আয়াজ এরূপ এক দল ডাকাতের দলপতি হইয়াও অত্যন্ত দয়ালু ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সংসার ত্যাগী ফকিরের ন্যায় গৈরিক বস্ত্র পরিধান ও হস্তে "তসবি" অর্থাৎ জপমালা ধারণ করিয়া থাকিতেন। তাঁহার "নমাজ" (উপাসনা) "রোজা" (উপবাস ব্রত) প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি প্রচলিত নিয়মের

অতিরিক্ত ছিল। পক্ষান্তরে তিনি অত্যাচারীর হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতেন, আপনার সর্ব্বস্ব দীনদরিদ্রকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়া পরম সুখী হইতেন। তাঁহার দলের কেহ তাঁহার এই সকল নিয়ম পালনে কিছুমাত্র অবহেলা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন।

দস্যুপতি ফজিলের সাধুতা সম্বন্ধে একটী ঘটনা এখানে লিখিতেছি। একদা তাঁহার পটমণ্ডপের অদূরে বিদেশ যাত্রী কোনও বণিক সম্প্রদায় তাঁহার দলকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। বণিকদিগের মধ্যে একজনের কিছু নগদ মুদ্রা ছিল। সে তাহা রক্ষা করিবার জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া পরিশেষে ফজিলের বস্ত্রাবাসে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে সেখানে জপ-মালাধারী নমাজের আসনে উপবিষ্ট একজন দিব্যকান্তি ফকিরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কাতরভাবে আপনার বিপদের কথা জানাইয়া তাঁহার নিকটে নিজের মুদ্রাগুলি জমা রাখিতে চাহিল। বলা বাহুল্য, এই ফকিরবেশধারী ব্যক্তি দস্যুদলপতি ফজিল আয়াজ। তিনি ইঙ্গিতে তাহাকে গৃহকোণে মুদ্রা গুলি রাখিয়া যাইতে বলিলেন। বণিক তাঁহার আদেশ পালন করিয়া সঙ্গীদের নিকটে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে তাহার সহযাত্রীগণ দস্যু কর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া হাহাকার করিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্বোক্ত বণিক তাহার গচ্ছিত মুদ্রা ফিরাইয়া লইবার জন্য ফজিলের বস্ত্রাবাসে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেখানে তাহার সহযাত্রিগণের লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিভাগ

হইতেছে ; বণিক ইহা দেখিয়া, "হায়, দস্যুর হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ফজিল তাহাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই ?" সে কম্পিত কলেবরে আপন গচ্ছিত ধনের কথা জানাইল। তখন উদারচেতা ফজিল বলিলেন, "যেখানে তোমার অর্থ রাখিয়াছিলে, উহা সেইখানেই আছে, লইয়া যাও।" বণিক দস্যুপতির এ প্রকার কল্পনাতীত বাক্যে যারপর নাই মুগ্ধ হইয়া সহর্ষে আপনার গচ্ছিত মুদ্রা গ্রহণ করিল এবং তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া আপন সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইল।

এদিকে ফজিলের সহচরগণ তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া বলিল, "এই বণিকদলের নিকটে নগদ মুদ্রা কিছুই পাওয়া যায় নাই, আপনি কেন এ টাকা প্রত্যর্পণ করিলেন ?" মহদাশয় ফজিল তাহাদিগের কথায় ঈষৎ হাসিয়া এই প্রত্যুত্তর দিলেন,— "এ ব্যক্তি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঐ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিল, আমিও ঈশ্বরের সম্বন্ধে সাধুভাব রক্ষা করিয়া তাহার সেই সাধুভাবকে বিনষ্ট হইতে দিলাম না। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার সাধুভাবকে রক্ষা করিবেন।"

অতি আশ্চর্য্যরূপে মহাত্মা ফজিলের দস্যুজীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। একদা রাত্রিতে ফজিল আয়াজ স্বদলবলে কোনও বিদেশগামী বণিকসম্প্রদায়কে আক্রমণ করিলে একজন বণিক হঠাৎ বলিয়া উঠেন, "কি ? এখনও সময় হয় নাই যে, তোমাদের নিদ্রিত মন জাগরিত হয় !" বণিকের এ কথাটী শাণিত কৃপাণাপেক্ষা দৃঢ়তররূপে ফজিলের হৃদয়ে আঘাত

করিল। ঘোরতর আত্ম-গ্লানিতে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল! তিনি অকস্মাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, সময় আসিয়াছে; নিদ্রিত মনের সুপ্তির ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। এই মুহূর্ত্ত হইতে আমার দস্যু-জীবনের অবসান হইল; আমি চলিলাম, আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন!"— করুণাময় পরমেশ্বরের অপার করুণা ও মহিমায় দস্যু সর্দ্দার ফজিলের সম্মুখে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল।

ইহার পর তিনি সেখানকার বাদশাহের নিকটে উপস্থিত হইয়া শাস্তি প্রার্থনা করিলেন। ন্যায়বান বাদশাহ দস্যু-পতি ফজিলের অন্তঃকরণে মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাকে আর শাস্তি দিবার প্রয়োজন নাই; ঈশ্বর তাঁহার প্রাণে যে অনুতাপ জাগাইয়া দিয়াছেন, তাহাতেই তিনি দগ্ধ হইতেছেন। তখন বাদশাহ ফজিলকে সসম্মানে ও সমাদরে তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

মহাত্মা ফজিল সাধু-জীবন লাভ করিয়া সস্ত্রীক মক্কায় চলিয়া যান এবং সেখানে আমরণ বাস করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বহুতর সাধু-সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সহবাসে আরও উন্নত জীবন লাভ করিয়াছিলেন। মক্কা-নিবাসী সকলেই তাঁহার সুমধুর ধর্ম্মোপদেশে সবিশেষ আকৃষ্ট হইতেন। বস্তুতঃ, তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য বিষয়ে তিনি তৎকালীন আরবীয়-ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

একদা রাত্রিতে খালিফ হারুন-অল-রসিদের মনে অত্যন্ত অশান্তি হওয়াতে তিনি মহাত্মা ফজিলের নিকটে উপস্থিত

হয়েন। ফজিল তখন ভগবৎ-প্রেমে বিভোর ছিলেন, তিনি প্রথমে খালিফকে তাঁহার কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুমতিই দিলেন না, পরে যখন খালিফ অনেক কাকুতিমিনতিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন, গৃহ-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে!—পাছে খালিফের মুখ দেখিয়া ফজিলের ধ্যান-ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কাতেই তিনি তাহা নিভাইয়া দিয়াছেন! বিশ্ব-রাজার যথার্থ সেবক না হইলে একজন সামান্য ফকীর, হারুন-অল-রসিদের ন্যায় একজন পরাক্রান্ত রাজার সহিত কখনও এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার করিতে সাহসী হইতে পারেন না।

যাহা হউক, অচিরে ফজিলের অমৃতবর্ষী উপদেশে খালিফের মনঃপ্রাণ শীতল হইল, তিনি বালকের মত রোদন করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি ফিরিবার সময় ফজিলের পদপ্রান্তে সহস্র মুদ্রাপূর্ণ একটী থলি রাখিয়া তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। নিস্পৃহ ফজিল ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া খালিফকে বলিলেন, “আমি কি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে বৃথা বাক্য-ব্যয় করিলাম? এতগুলি সদুপদেশে কিছুমাত্র ফল হইল না? ইতিমধ্যেই তুমি আবার অত্যাচার ও অবিচার আরম্ভ করিলে? আমি তোমাকে লঘুভার করিতে চাহিতেছি,—মুক্তির পথে আহ্বান করিতেছি, আর তুমি আমাকে তৎপ্রতিদানে গুরুতর ভারাক্রান্ত করিয়া নিদারুণ নিরয়ে নিক্ষেপ করিতে চাও? আমি পুনঃপুনঃ বলিতেছি, তোমার যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরকে দাও, তাঁহার সেবায় ব্যয় কর। যাহাকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, তুমি তাহাকেই ঐ

গুলি দিতে চাহিতেছ? হায়! আমার কথায় তোমার কোন উপকার হয় নাই!" এই বলিয়াই মহাত্মা ফজিল গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক গৃহ-দ্বার পুনরায় রুদ্ধ করিয়া দিলেন। খালিফ তাঁহার এরূপ ব্যবহারে যারপরনাই মুগ্ধ ও আশ্চর্য্য হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সহচরকে বলিলেন, "ইনিই প্রকৃত সাধু!"

মহাত্মা ফজিলের নির্জ্জনবাস অতিশয় প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন, "যে ব্যক্তি নির্জ্জনতাকে ভয় করে, সে লোকের সহিত প্রণয় স্থাপন করিয়া শান্তিহারা হয়।" এজন্য তিনি জন-কোলাহলপূর্ণ দিবস অপেক্ষা নীরব রাত্রি বেশী ভাল-বাসিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই এরূপ বলিয়াছেন, "রজনী উপস্থিত হইলে নির্জ্জন বলিয়া আমি আনন্দিত হই, দিবসে জন-কোলাহলে বিষণ্ন থাকি। আমার ইচ্ছা, কেহ আমাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিষয়ান্তরে ব্যস্ত না করে।"

মহাত্মা ফজিল সর্ব্বদা বিমর্ষভাবে কাল কাটাইতেন। প্রায় ত্রিশ বৎসরাবধি কেহ তাঁহার মুখে হাসি দেখে নাই; কিন্তু যেদিন তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয়, সেদিন তিনি হাসিয়াছিলেন! সকলেই তাঁহার এই অদ্ভুত ব্যবহারে বিশেষ বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহাকে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ঈশ-গত-প্রাণ ফজিল উত্তর করিলেন, "অদ্য জানিতে পারিলাম, ঈশ্বর ইহার মৃত্যুতে সন্তুষ্ট; তাঁহার সেবক কিরূপে প্রভুর সন্তোষে যোগদান না করিয়া থাকিবে? তাই হাসিলাম।" তাঁহার কথা শুনিয়া সকলের বিস্ময় গভীর শ্রদ্ধাতে পরিণত হইল।

মহাত্মা ফজিল পরলোকগমনের সময় তাঁহার দুইটী কন্যাকে

ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া যান। এমেন দেশাধিপতি ইহা অবগত হইয়া আপনার পুত্রদ্বয়ের সহিত মহাসমারোহে তাহাদিগের পরিণয় প্রদান করেন। ভক্তবৎসল ভগবানের দ্বারে এরূপেই তাঁহার বিশ্বাসী ভক্ত সন্তানের বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন।

নিজের চেষ্টায় ও যত্নে মানুষ কিরূপে সামান্য অবস্থা হইতে আত্মোন্নতি সাধন করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় জনসাধারণের সেবার জন্য ব্যয় করিতে পারে, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমেরিকার অন্তর্গত বোস্টন নগরে তিনি ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সেখানে বাতি ও সাবান প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। এজন্য বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বাল্যকালে দুই বৎসর মাত্র গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

বেঞ্জামিনের যখন দশ বৎসর মাত্র বয়স, তিনি তখন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্বীয় ব্যবসাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এ সময় নানা বিষয়ে তিনি পিতার অনেক সাহায্য করিতেন। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে তাঁহার গভীর অনুরাগ ও মনোযোগ থাকায় অনেক সময়

কাজের ক্ষতি হইত; এজন্য দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইতে অনুমতি দিলেন।

ইহার পর নয়বৎসর পর্য্যন্ত বেঞ্জামিন তাঁহার অগ্রজের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এখানে তিনি বহু পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। অনেক সময় তিনি কাহারও নিকট হইতে সন্ধ্যাবেলা কোনও পুস্তক চাহিয়া আনিতেন এবং পরদিন প্রাতে ফেরৎ দিতে হইবে বলিয়া সারা রাত জাগিয়া সেই বহিখানি পড়িয়া শেষ করিতেন। তাঁহার এরূপ অদম্য পাঠেচ্ছা লক্ষ্য করিয়া একজন ধনী সদাগর তাঁহার উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়টী ব্যবহার করিবার জন্য বেঞ্জামিনকে অনুমতি দিয়াছিলেন, ইহাতে বেঞ্জামিন অতিশয় উপকৃত হইয়াছিলেন।

এ সময় তিনি কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহার কবিতার ভুল দেখাইয়া দিলে তিনি পিতার আদেশে কবিতা লেখা পরিত্যাগ করিয়া গদ্য রচনায় মনোযোগী হয়েন।

যখন বেঞ্জামিনের একুশ বৎসর বয়স, তখন তিনি বোষ্টন পরিত্যাগ করিয়া নিউইয়র্ক নগরে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার কাজের কোনরূপ সুবিধা না হওয়ায় তিনি ফিলাডেলফিয়াতে গমন করেন এবং কীমার নামক একজন ভদ্রলোকের ছাপাখানায় মুদ্রাকরের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। ইতিপূর্ব্বে পাথেয় সংগ্রহ করিতে গিয়া তাঁহার প্রিয় পুস্তকগুলি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল; এক্ষণে যথোচিত পরিশ্রম করিয়া

তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহাতে মিতব্যয়িতার গুণে আবার পুস্তক ক্রয় করিয়াও তাঁহার কিছু টাকা সঞ্চয় হইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে বেঞ্জামিন নিজেই ফিলাডেলফিয়াতে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি অত্যন্ত কর্ম্মপটু ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল, চারিদিক হইতে নানারূপ কাজের ভার পাইতে লাগিলেন। এ সময় তাঁহার প্রচুর ধনাগম হইতে থাকিলেও মনে কখনও অহঙ্কারের ভাব জাগে নাই; ছাপাখানার জন্য কাগজ কিনিয়া তিনি একচাকার একখানা গাড়ীতে করিয়া সামান্য একজন মুটের ন্যায় নিজেই তাহা ঠেলিয়া লইয়া যাইতেন, শারীরিক কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্যকে তিনি কখনও লজ্জাজনক ও মর্য্যাদা হানিকর মনে করিতেন না।

এ সময় তিনি মিস্ রীড নাম্নী একটী ভদ্রমহিলার পাণিগ্রহণ করেন। সৌভাগ্য বশতঃ রীড সর্ব্বাংশে বেঞ্জামিনের উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী ও সকল কার্য্যে সাহায্যকারিণী ছিলেন।

বেঞ্জামিনের চরিত্র নানা সদ্গুণে বিভূষিত ছিল। তিনি এরূপ উন্নত জীবন লাভ করিবার জন্য রীতিমত সাধনা করিতেন। তিনি একখানা খাতা করিয়া তাহাতে সত্য, সরলতা, বিনয়, ধৈর্য্য প্রভৃতি সকল সদ্গুণের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যেদিন যে গুণটী তিনি অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিতে পারিতেন না, সেদিন খাতার নির্দ্দিষ্ট স্থল চিহ্নিত করিতেন এবং ভবিষ্যতে আর যাহাতে এরূপ ত্রুটি না ঘটে

সেজন্য অনুতপ্ত-হৃদয়ে ও কাতর-প্রাণে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রত্যেক দিনের কার্য্যের সময়ও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল, তিনি একটী মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করিতেন না।

ক্রমে বেঞ্জামিন একখানি সংবাদ পত্র সম্পাদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার লিখিত মূল্যবান প্রবন্ধগুলি বিশেষ সারগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক হওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই এই সংবাদ পত্রখানি সর্ব্বসাধারণ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

১৭৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি "দুঃখী রিচার্ডের পঞ্জিকা" নামক পুস্তিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা পরে "ধনাগমের পথ" নামক একখানি পুস্তকে পরিণত হয়। এ পুস্তক খানি এমন উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, নানা ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে। বেঞ্জামিন নিজেও ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়, স্পানিস, লাটিন প্রভৃতি বহুভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

শুধু আত্মোন্নতি সাধন বেঞ্জামিনের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। কিসে পরের উপকার হয়, কিসে স্বদেশের উন্নতি হয়, কিসে জগতের কল্যাণ হয়, ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ও অবিচলিত লক্ষ্য ছিল। এক্ষণে তিনি ধীরে ধীরে এই লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার জ্ঞান ও কার্য্যকুশলতার সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং সর্ব্বোপরি নির্ম্মল চরিত্র মিলিত হওয়ায় তিনি পদে পদে সফলতাও লাভ করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে আমেরিকায় সাধারণের জন্য কোন পুস্তকালয় ছিল না। বেঞ্জামিন সর্ব্বপ্রথম ফিলাডেল্‌ফিয়াতে তাহা প্রতিষ্ঠা

করিলেন। তাঁহার যত্নে আমেরিকায় সর্ব্বপ্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিলাডেল্‌ফিয়াতে একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। এতদ্ব্যতীত নগরের অপরাপর উন্নতিকর অনুষ্ঠানগুলিও প্রধানতঃ তাঁহারই দ্বারা সাধিত হইল।

বেঞ্জামিন যেমন ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের সর্ব্বপ্রকার উপকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তেমনি তাঁহার দেশবাসী তাঁহার প্রতি নানা ভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া যথোচিত কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে, বেঞ্জামিনের যখন একচল্লিশ বৎসর বয়স, তখন সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে স্থানীয় জাতীয় মহাসমিতিতে আপনাদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিলেন। এই মহাসভার গুরুতর কার্য্যভার লইয়া তিনি কয়েকবার ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতিতে যাতায়াত করিয়াছিলেন এবং এই সূত্রে পাঁচটী রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় ঘটিয়াছিল; তিনি তাঁহাদের সকলেরই নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের সহিত ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে যে সন্ধির প্রভাবে আমেরিকা আজ স্বাধীন প্রদেশে পরিণত হইয়াছে, বেঞ্জামিন সে সন্ধিপত্রের মুসবিদা বা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাদের সকলের মুখপাত্রস্বরূপ সে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ইহা একদিকে যেমন তাঁহার অসামান্য গৌরবের কথা, তেমনি অপরদিকে সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে কিরূপ

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিত, এবং তিনি আপনার মাতৃভূমিকে কত ভালবাসিতেন, তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐ বৎসরই বেঞ্জামিন আমেরিকার জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি পদে বরিত হয়েন। বেঞ্জামিন অন্যূন পাঁচ বৎসর কাল জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অতি সুচারুরূপে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন।

বর্ত্তমান সময়ে বজ্রপাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত অট্টালিকাদির চূড়ায় যে লৌহ শলাকা প্রোথিত দেখা যায়, বেঞ্জামিন তাহার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং লণ্ডনের রয়েল সোসাইটী বা রাজকীয় সমিতি তাঁহাকে একটী অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্ণপদক দিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

আমেরিকায় তখন দাস-ব্যবসা প্রচলিত ছিল। দাস-ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা হইতে কাফ্রি নরনারীকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া গরু ছাগল প্রভৃতি পশুর ন্যায় বাজারে বিক্রয় করিত। বেঞ্জামিন জাতীয় মহাসমিতি হইতে অবসর লইয়া এ ঘৃণিত ব্যবসা রহিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। যাঁহারা দাস-ব্যবসায়ের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা এক বিরাট সমিতি গঠন করিয়া বেঞ্জামিনকে তাহার সভাপতিপদে বরণ করিলেন। বেঞ্জামিনের অক্লান্ত যত্নে ও চেষ্টায় সভ্যজগতের

এই মহাকলঙ্ক অচিরে চিরকালের জন্য দুরীকৃত হইল, দাস-ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হইল। এই মহা পবিত্র অনুষ্ঠানে ইংলণ্ড বিশ কোটি টাকা সাহায্য করিয়া প্রকৃত মনুষ্যোচিত সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অপার করুণা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কর্ম্মবীর বেঞ্জামিন অতি সামান্য অবস্থা হইতে দেশের সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অসাধারণ সৌভাগ্য-সম্পদের জন্য তিনি সর্ব্বদা বিধাতার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিতেন। তাঁহার জীবন স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রবণ ও উপাসনাশীল ছিল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী তারিখে চৌরাশি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি লোকান্তরিত হয়েন। তাঁহার অভাবে সমস্ত দেশে শোকের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল এবং বিংশতি সহস্রেরও অধিক সংখ্যক লোক তাঁহার সমাধি ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার মৃত দেহের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল।

একটী সুদীর্ঘ শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও আমেরিকাবাসীর অন্তঃকরণে বেঞ্জামিনের গৌরব-সিংহাসন তেমনি অক্ষুন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; তাঁহার দেহত্যাগ দিবসে এখনও প্রতিবৎসরে কত গুণী জ্ঞানী একত্রে সমবেত হইয়া তাঁহার অমর আত্মার প্রতি ভক্তির অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কীর্ত্তিমান, তাঁহারা জগতে এইরূপেই চিরস্মরণীয় হইয়া সর্ব্বদা মানব-হৃদয়ে বিরাজ করেন।

দেবব্রতের আত্ম-ত্যাগ।

পুরাকালে আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কুরুনামক একজন মহাপরাক্রমশালী ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি যেখানে বসিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা পরম পবিত্র তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে এবং "কুরুক্ষেত্র" নামে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজর্ষি কুরুর বংশে মহারাজ শান্তনু জন্ম-গ্রহণ করেন। দেবব্রত তাঁহারই প্রিয়তম সন্তান।

সে সময়ে দেবব্রতের ন্যায় শৌর্য্য-বীর্য্যশালী ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না। মহারাজ শান্তনু উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সচরাচর মৃগয়াদিতে ব্যাপৃত থাকিতেন।

একদা সদা-প্রফুল্ল মহারাজকে বিমর্ষ ও বিমনস্ক দেখিয়া দেবব্রত সাতিশয় চিন্তিত ও ব্যথিত হইলেন এবং বিশ্বস্ত মন্ত্রীর নিকটে কারণানুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, বিপত্নীক মহারাজ শান্তনু দাসরাজের দুহিতা সত্যবতীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন, কিন্তু দাসরাজের কঠোর সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার শক্তি না থাকায় তাঁহার সে মনস্কামনা সফল হইতেছে না; তাই তিনি বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন।

পিতৃভক্ত দেবব্রত পিতার মর্ম্ম-বেদনা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সপার্ষদ দাসরাজের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজ শান্তনুর জন্য সত্যবতীকে প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ কুমার

দেবব্রতকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, "যুবরাজ! আপনি যদি অভয় দেন, তবে আমি আনন্দের সহিত মহারাজকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। আমার একান্ত ইচ্ছা, সত্যবতীর যে সন্তান হইবে, ভবিষ্যতে সেই সন্তানই কুরুকুলের রাজ-সিংহাসনে আরোহন করে। কিন্তু আপনি বর্ত্তমানে কিরূপে তাহা সম্ভব?"

উদার-হৃদয় দেবব্রত দাসরাজের কথা শুনিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যিনি তোমার কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমার পিতৃ-সিংহাসনের অধিকারী হইবেন, আমিও তাঁহাকে বিস্তৃত কুরুরাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিব। আমি আজ আমার পিতৃ-সিংহাসনে দাবী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতেছি। আমার এই প্রতিজ্ঞার অণুমাত্র ব্যতিক্রম কখনও ঘটিবে না।"

যুবরাজকে প্রশংসা করিয়া দাসরাজ আবার বলিলেন, "কুমার! আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আমি জানি, আপনার কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু আপনার সন্তানেরা তো কুরুরাজ্য অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। তাঁহাদিগকে যে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।"

পিতৃভক্তির অমৃত-প্লাবনে দেবব্রতের বিশাল হৃদয় তখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, নিজের কোন প্রকার ক্ষুদ্র সুখ কিংবা তুচ্ছ স্বার্থ-চিন্তার স্থান সেখানে আর নাই। তিনি অম্লানবদনে উত্তর দিলেন —"আমি ইতিপূর্ব্বে পিতৃ-সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন

আবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি এ জীবনে কখনও বিবাহ করিব না। তাহা হইলে, আমার সন্তান হইতে আপনার আর কোন আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। আপনি স্থির জানিবেন, যদি সূর্য্যদেব পশ্চিমে উদিত হন, যদি অগ্নি উত্তাপশূন্য হয়, যদি পৃথিবীতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া সমস্ত ধ্বংস হইয়া যায়, তথাপি আমি প্রতিজ্ঞাপালনে কখনও পশ্চাৎপদ হইব না।"

দাসরাজ দেবব্রতের এই আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "যুবরাজ! আমার আর কোন আপত্তি নাই, আমি আপনার পিতাকেই আমার কন্যা সম্প্রদান করিলাম, আপনি তাহাকে লইয়া যান।"

এ সময়ে সহসা চারিদিক হইতে দেবব্রতের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল এবং তিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে "ভীষ্ম" নামে অভিনন্দিত করিতে লাগিল।

দেবব্রত অবিলম্বে সত্যবতীকে লইয়া রাজধানী হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে পিতৃ-করে সমর্পণ করিয়া কর-যোড়ে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। মহারাজ শান্তনু প্রিয়তম পুত্রের এই অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগের কথা শুনিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস! সন্তানের সুখের জন্য পিতা আপনার সকল সুখ হাসিমুখে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু পুত্র যে পিতার সুখের জন্য এরূপ ভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে পারে, তাহা জানিতাম না। তুমি আজ জগতে এক অসাধারণ পিতৃ-ভক্তির নূতন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছ। মহর্ষিরা বলিয়াছেন—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

"পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা, পিতা প্রীতি লাভ করিলেই সমস্ত দেবতা প্রীত হয়েন।" বৎস দেবব্রত! তুমি এই পবিত্র ঋষি-বাক্য প্রতিপালন করিতে যেরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ—যেরূপ কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ইচ্ছা না করিলে কখনও তোমার মৃত্যু হইবে না।"

লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র।

কাল রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। সমস্ত অযোধ্যা নগরী আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছে। এমন সময় রাজ-মহিষী কৈকেয়ী মহারাজ দশরথের নিকটে তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দুইটী বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি মহারাজ দশরথকে বলিলেন, "সত্যরক্ষা করিতে হইলে রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে পাঠাইয়া আমার পুত্র ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসন দান করিতে হইবে।"

মুহূর্ত্তমধ্যে অযোধ্যার সকল হর্ষ-কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল। মহারাজ দশরথ অকস্মাৎ বজ্রাহতের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইলেন। রামচন্দ্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সকলের প্রিয়, তাঁহাকে কিরূপে বিনাদোষে রাজ্যচ্যুত করিয়া ভীষণ অরণ্যে নির্ব্বাসন দেওয়া যায়? পক্ষান্তরে, যে সূর্য্যবংশ শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানে ও করুণায়

সমগ্র ভারতের আদর্শ, যে বংশে সত্য-ভঙ্গ-দোষে এ পর্য্যন্ত কেহই কলঙ্কিত হয়েন নাই, মহারাজ দশরথ সেই মহা গৌরবান্বিত বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হইয়া কি প্রকারে আপনার সত্য-রক্ষা না করিবেন ?

পিতৃবৎসল রামচন্দ্র অকুণ্ঠিত চিত্তে এ বিষম সমস্যার সমাধান করিলেন। তিনি পিতৃসত্য পালনার্থ অযোধ্যার রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ দশরথ তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিলেন না।

প্রভাতের তরুণ রবি উদয় হইতে না হইতেই নিবিড় কাল মেঘে ঢাকিয়া গেল। কিন্তু এই গভীর বিষাদকালিমার ভিতরে সুমধুর ভ্রাতৃ-প্রেমের এমন একটী বিমলধারা প্রবাহিত হইল, যাহাতে অযোধ্যাবাসীগণ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া গেল।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আশৈশবের সাথী। তিনি সর্ব্বদা ছায়ার মত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। আজও তিনি অযোধ্যার রাজসম্পদ এবং পিতামাতা, সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ-সুখ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্য-বাসের কষ্টভোগ শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

লক্ষ্মণের এই আশ্চর্য্য সৌভ্রাত্র ও আত্ম-ত্যাগের কাহিনী অবিলম্বে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রাদেবী পবিত্র নেত্র-নীরে তাঁহাদের স্নেহের সন্তানদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন।

পতি-প্রাণা সীতাদেবীও রামচন্দ্রকে ছাড়িয়া অযোধ্যার রাজ-সুখ ইচ্ছা করিলেন না। তিনিও রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত দুষ্কর বন-বাস-ব্রত আনন্দে বরণ করিয়া লইলেন। কেহই তাঁহার সংকল্পে বাধা দিতে পারিলেন না। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বন-গমনের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবময়ী অযোধ্যা নগরী প্রকৃতিপুঞ্জের আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইয়া গেল।

তারপর কত বিপদ-আপদের ভিতরে, কত যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে ভ্রাতৃ-বৎসল লক্ষ্মণ একটী মুহূর্ত্তের জন্যও অগ্রজের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই—অগ্রজের সেবাশুশ্রূষা করিতে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নাই। লক্ষ্মণ সেই ভীষণ অরণ্যে শ্রীরামচন্দ্র ও জানকীর জন্য প্রতিদিন ফলমূল আহরণ করিয়া আনিতেন এবং ধনুর্ব্বাণ-করে সারারাত্রি জাগিয়া তাঁহাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিতে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের ন্যায় ভাই পাইয়া বন-বাসের সকল দুঃখ-কষ্ট বিস্মৃত হইলেন।

অগ্রজের প্রতি কনিষ্ঠের এত ভালবাসার দৃষ্টান্ত, জগতের ইতিহাসে বড় বিরল। ঘরে ঘরে লক্ষ্মণের মত ভাই জন্মগ্রহণ করিলে, পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়া যায়!

বিশাখার করুণা।

একদা শ্রাবস্তি নগরীতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মান মর্য্যাদা সকলই বিস্মৃত হইয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু যেখানে জননী স্বীয় সন্তানের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে ব্যাকুল, সেখানে কে কাহাকে ভিক্ষা দিবে?

এ সময়ে পরম করুণাময় বুদ্ধদেব শ্রাবস্তি নগরীর "পূর্ব্বারাম" নামক বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন যাবতীয় শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ তাঁহার নিকটে সমবেত হইয়া আপনাদের ও সর্ব্বসাধারণের দুঃখের কথা নিবেদন করিতেছিলেন। জগতের কষ্ট নিবারণ করিবার নিমিত্ত যিনি রাজপুত্র হইয়াও আজ সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তিনি কেমন করিয়া সে করুণ-কাহিনী নীরবে শ্রবণ করিবেন? তাঁহার স্বভাব-কোমল প্রাণ দ্রবীভূত হইল। তিনি উপস্থিত জনসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এখানে কে এমন সহৃদয় ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন, যিনি এই সহস্র সহস্র বুভুক্ষু নরনারীকে অন্নদান করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিতে পারেন?"

পর-দুঃখ-কাতর অমিতাভের গম্ভীর কণ্ঠ সমাগত জনসমুদ্রকে আন্দোলিত করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। অন্তরে ইচ্ছা জাগিলেও সেখানে এমন দুঃসাহসিক শক্তি কাহারও ছিল না, যিনি দেশের এ ঘোর দুর্দ্দিনে দুঃস্থ নরনারীর জন্য

অন্নছত্র উন্মুক্ত করিতে বা তাহাদের জন্য কোনরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারেন। সুতরাং বুদ্ধদেবের কথায় প্রত্যুত্তর দিতে না পারিয়া সকলেই বিষাদে মস্তক অবনত করিলেন।

বুদ্ধদেব জনসঙ্ঘকে লক্ষ্য করিয়া আবার সেই প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু অক্ষমতাবশতঃ সেই করুণার আহ্বানে কেহই সাড়া দিতে পারিলেন না। সেই বিশাল জন-সমুদ্র নীরব নিস্তব্ধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

নিরাশা কাহাকে বলে সিদ্ধার্থ কখনও জানেন না। তিনি আবার সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন, "মৃত্যুর দ্বার হইতে কে অসহায় নরনারীকে ফিরাইয়া আনিবে ? কে তেমন দয়ালু আছ ? এস, অগ্রসর হও ! আমি তাহাকে দেখিতে চাই !"

এবার সহসা একপ্রান্ত হইতে একটী ক্ষীণ রমণীকণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল,—"ভগবন্! আপনি যদি আশীর্ব্বাদ করেন, তবে আমি আমার দরিদ্র ভাইবোনের সেবার ভার গ্রহণ করিতে পারি।" সহস্র সহস্র বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি যুগপৎ সে দিকে পতিত হইল। সকলেই দেখিতে পাইলেন, পীতবাসধারিণী ভিক্ষুণী বিশাখা নত-মস্তকে ও ধীর-পদে অমিতাভের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ভিক্ষুণী বিশাখার এই অসম সাহস দেখিয়া বিশাল জনসমাজ বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় অকস্মাৎ আলোড়িত হইয়া উঠিল। অনেকেই মনে করিলেন, অনশন-ক্লিষ্টা বিশাখার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। না হইলে, যে দুষ্কর কাজের ভার লইতে শ্রাবস্তির

নৃপতি ও ধনীগণ সাহস পান নাই, বিশাখা সামান্যা ভিক্ষুণী হইয়া কি প্রকারে সে কার্য্যে অগ্রসর হইতেছে ?

নাগরিকগণের মনোভাব বুদ্ধদেবের অবিদিত রহিল না। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ ! ভিক্ষুণী বিশাখা অপ্রকৃতিস্থা নহে। করুণার আহ্বান তাহার কোমল প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে। তথাপি, সে এই দুঃসাহস কোথা হইতে পাইল, তোমরাই তাহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

দরিদ্র-জননী বিশাখা জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া উত্তর করিলেন, "আমি জানি, আমি নগণ্যা ভিক্ষুণী মাত্র, একটী কপর্দ্দকও আমার সম্বল নাই। কিন্তু আপনারাই আমার একমাত্র ভরসা। আমার আশা আছে যে, আমি আপনাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আমার ক্ষুধাতুর ভাইবোনের জীবনরক্ষার একটা উপায় করিতে পারিব। আপনারা আমার এই প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। ভগবান তথাগত আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

মুহূর্ত্তে সকল জন-কোলাহল স্তব্ধ করিয়া ভিক্ষুণী বিশাখার আবেগ-কম্পিত করুণ-কণ্ঠ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। করুণার অবতার বুদ্ধদেব দক্ষিণ বাহু তুলিয়া বিশাখাকে বলিলেন, "বৎসে ! আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অবিলম্বে তোমার পবিত্র মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। আবার শ্রাবস্তি নগরীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

অমিতাভের আশ্বাস বাণী শেষ হইতে না হইতেই "ত্রিরত্নের" অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের জয়-ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। দাম্ভিক ধনীগণ দয়াময়ী বিশাখার পবিত্র পদ-ধূলি স্পর্শ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিলেন।

পান্নার রাজভক্তি।

চিতোরের রাণা উদয়সিংহ যে পর্য্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক না হয়েন, সে পর্য্যন্ত বনবীর রাজ্যশাসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বনবীর সিংহাসনের মোহে হিতাহিত জ্ঞান ও ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি কিরূপে ষড়্‌বর্ষীয় সুকুমার বালক উদয়সিংহকে গোপনে হত্যা করিয়া নিজের সিংহাসনলাভের পথ নিষ্কণ্টক করিবেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিশু রাণা উদয়সিংহ রাত্রিতে আহার করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া ধাত্রী পান্নাকে জানাইল, রাজ্য-লোভী বনবীর রাণাকে বধ করিতে আসিতেছেন। তখন আর ভাবিবার অবসর ছিল না। পান্না তৎক্ষণাৎ একটী ফলের চাঙ্গারীর মধ্যে সুপ্ত রাণাকে রাখিয়া ও তাহার উপরিভাগ পত্রাদিতে ঢাকিয়া তাহা সেই বিশ্বস্ত ভৃত্যটীকে দিলেন। সে সেই মুহূর্ত্তে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া রাণাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গেল।

তারপর পান্না আপনার ঘুমন্ত শিশুসন্তানটীকে আস্তে আস্তে লইয়া রাণা উদয়সিংহের বিছানায় স্থাপন করিলেন। রাজভক্তির প্রবল তরঙ্গে ধাত্রী পান্নার বিশাল অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই স্বহস্তে আপন প্রাণাধিক সন্তানকে আসন্ন-

মৃত্যুর মুখে তুলিয়া দিতে তাঁহার মাতৃ-হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত বা কম্পিত হইল না।

সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষে উন্মুক্ত অসিহস্তে বনবীর প্রবেশ করিলেন এবং ধাত্রীকে রাণা উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পান্না কোন কথা না বলিয়া, নীরবে ও অধোমুখে, স্বীয় নিদ্রিত পুত্ত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। ধাত্রীপুত্ত্রকে রাণা মনে করিয়া নিষ্ঠুর বনবীর তাহার প্রাণসংহার করিলেন। নিজের চক্ষুর সম্মুখে আপনার প্রিয়তম সন্তানের নিদারুণ অপঘাত মৃত্যু দেখিয়াও পান্না মুখ ফুটিয়া সামান্য একটী বিলাপ-ধ্বনি করিবারও সুবিধা পাইলেন না। তিনি নীরবে বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া সেই গভীর নিশীথ সময়ে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া রাণা উদয়সিংহের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

এই প্রকারে ধাত্রী পান্নার মহান্ আত্মোৎসর্গের ফলে বাপ্পারাওর পবিত্র বংশ রক্ষিত হইল। এই উন্নত-হৃদয়া ও রাজভক্তি-পরায়ণা রাজপুত রমণীর নাম এখনও রাজপুতগণ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন।

আলীর সাহস।

মহাত্মা আলী হজরত মোহাম্মদের পিতৃব্যপুত্র। পুরুষ-দিগের মধ্যে আলী সর্ব্বপ্রথম ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে একমাত্র হজরত মোহাম্মদের সহধর্ম্মিনী খাদিজা দেবী এই নূতন ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন।

আলীর অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য ও সাহসের অনেক ঘটনা মুসলমান সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে। একদা আলীর অতি অল্পবয়সে কোরেশগণ হজরত মোহাম্মদকে গভীর নিশীথে হত্যা করিয়া তাঁহার প্রচারিত নবীন ধর্ম্ম ইস্‌লামের মূলোৎপাটন করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। হজরত ইহা অবগত হইয়া পূর্ব্বেই সতর্ক হইলেন। কিন্তু অসমসাহসী আলী সেই রজনীতে অকুতোভয়ে মোহাম্মদের শয্যায় একাকী শায়িত হইয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ কোরেশগণ হজরত মোহাম্মদের পরিবর্ত্তে একটী ক্ষুদ্র বালককে পাইয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

ইহার পর আলী নানা যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব দেখাইয়া "আসদোল্লা" বা "ঐশ্বরিক-সিংহ" এই গৌরবাত্মক উপাধিতে ভূষিত হয়েন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও দুইটী উপাধি ছিল, তাহার একটীর অর্থ "পুনঃ পুনঃ আক্রমণকারী" এবং দ্বিতীয়টীর অর্থ "সৈন্যশ্রেণী ভেদকারী।" এই সমস্ত উপাধিই তাঁহার অতুল শৌর্য্য ও সাহসের পরিচায়ক।

একবার ইহুদিদিগের সঙ্গে হজরত মোহাম্মদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে হজরতের এক এক জন সেনাপতি এক এক দিন ইহুদিগণের দুর্গ অধিকার করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ ও পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন। পরিশেষে মহাবীর আলী প্রেরিত হয়েন এবং ঘোর সংগ্রামে জয়লাভ করেন। এইরূপ কথিত আছে যে, যুদ্ধকালে তিনি সিংহ-বিক্রমে দুর্গের সম্মুখস্থ লৌহময় কপাট ভগ্ন করিয়া আপনার ঢালস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই কপাটখানি এত ভারী ছিল যে, সাতজন বলবান মুসলমান একযোগে চেষ্টা করিয়াও উহা একদিক হইতে অন্যদিকে ঘুরাইতে পারিত না এবং চল্লিশ জন মুসলমান তাহা ভূমি হইতে উত্তোলন করিতে সক্ষম হইত না।

আলী যে কেবল শারীরিক শক্তিতে ও সাহসে অনন্যসাধারণ ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার আধ্যাত্ম-জীবনও অত্যন্ত উন্নত ছিল। তাঁহার পূর্ব্ব নাম "হরদর" বা শার্দ্দূল, হজরত মোহাম্মদ তাঁহাকে "আলী" অর্থাৎ সমুন্নত এই আখ্যা প্রদান করেন। তিনি এই "আলী" নামেই বিখ্যাত।

হজরত মোহাম্মদ তাঁহার একান্ত প্রিয়পাত্র ধর্ম্মপরায়ণ ও সাহসী আলীর সহিত তাঁহার স্নেহের দুহিতা ফাতেমার বিবাহ দেন। ফাতেমা অতিশয় রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন বলিয়া কোরেশ বংশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ধনী যুবক তাঁহার পাণি-প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ দরিদ্র আলীকেই ফাতেমার সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, উত্তরকালে সাহসী আলী নিজের গুণে সমস্ত মুসলমান সমাজের খলিফা বা ধর্ম্ম-নেতার পদে বৃত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা আলীকে মুসলমান বীরপুরুষেরা অদ্যাপি বীর-দেবতা জ্ঞানে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সংগ্রামাদিতে সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ করিতে হইলে এখনও "আলী" "আলী" বলিয়া সিংহনাদ করিয়া থাকেন। "আল্লা হু আক্‌বরের" ন্যায় ইহাও তাঁহাদিগের জাতীয় জয়-ধ্বনি। অটল ধর্ম্ম-প্রবণতার সহিত সাহস ও শৌর্য্য মিলিত হইলে মানুষ কতদূর মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে, আলীর এ গৌরব তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আরুণির গুরুভক্তি।

অতি পুরাকালে অবন্তীনগরে সন্দীপন নামক একজন ঋষি বাস করিতেন। তিনি বহু বালককে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। সে সময়ে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ বড় মধুর ছিল। শিষ্যগণকে সর্ব্বদা গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া গুরু-শুশ্রূষাদ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইত। পরম শুভানুধ্যায়ী গুরু ও গুরুপত্নী পিতা-মাতার ন্যায় অপরিসীম স্নেহে একদিকে যেমন শিষ্যদিগের সকল অভাব পূর্ণ করিতেন, তেমনি যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে সংসারে চরিত্রবান ও লব্ধযশা হইয়া সুখে শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

সন্দীপন ঋষির শিষ্যগণের মধ্যে উদ্দালক, উতঙ্ক ও আরুণি গুরু-সেবা এবং গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তনের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গভীর অধ্যবসায় হেতু তাঁহারা এক এক জন সর্ব্বশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষতঃ তাঁহাদের অলৌকিক গুরুভক্তির জন্য সহস্র সহস্র বৎসর পরে এখনও আমরা তাঁহাদের নাম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত স্মরণ করিয়া থাকি।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কোনদিন শাস্ত্রজ্ঞ মনীষির অভাব ঘটে নাই। কিন্তু সে সময়ে গুরু-ভক্তি শিষ্যগণের মজ্জাগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলেও ইঁহাদিগের গুরুভক্তি অতীব অসাধারণ। এজন্য ভারতের পুরাণেতিহাসের একাংশ ইঁহাদের কীর্ত্তি-কাহিনীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আজ আমরা কেবলমাত্র আরুণির বিষয় আলোচনা করিব। সন্দীপন ঋষির একটী ছোট শস্যের ক্ষেত ছিল। তখন সকলেরই এরূপ অল্পস্বল্প শস্যক্ষেত্র থাকিত, তাঁহারা স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিয়া আপনাদিগের পরিবারের ভরণপোষণের উপযোগী শস্য আহরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা অপমান মনে করিতেন না। বরং কৃষিকর্ম্মই তখন তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ও গৌরবের জিনিষ ছিল।

যাহা হউক, একদিন প্রভাতে ঋষি সন্দীপন তাঁহার প্রিয় শিষ্য আরুণিকে বলিলেন, "বৎস ! ক্ষেতের একটী আলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তুমি আজ উহার সংস্কার করিও" আরুণি নত-মস্তকে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

কিন্তু সেই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আরুণি কিছুতেই আলি বন্ধন করিতে পারিলেন না। বারে বারে প্রবল জলস্রোত তাঁহার সকল যত্ন ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে একান্ত নিরুপায় হইয়া গুরু-ভক্ত আরুণি সেই ভাঙ্গা-আলির একপার্শ্বে শয়ন করিলেন। প্রাণ দিয়াও গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে।

এদিকে দেখিতে দেখিতে গোধূলি বহিয়া গেল। রজনীর গভীর অন্ধকার ধীরে ধীরে ধরিত্রীর চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সন্দীপন ঋষির অন্যান্য শিষ্যেরা সকলেই অনেকক্ষণ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আচার্য্য সন্দীপন একবার সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সান্ধ্য-হোম সমাপ্ত হইয়া গেল, এখনও আরুণি আশ্রমে ফিরিয়া আসিল না কেন?" সকলে নীরব; শুধু শিষ্যশ্রেষ্ঠ উদ্দালক যুক্তকরে প্রত্যুত্তর করিলেন, "দেব! আপনি প্রভাতে তাহাকে ক্ষেতের আলি বন্ধন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সে তখন ক্ষেতে গমন করিয়াছে আর আশ্রমে ফিরিয়া আসে নাই।" বিস্মিত-চিত্তে আচার্য্য বলিলেন, "চল, সে সেখানে এতক্ষণ কি করিতেছে, আমরা দেখিতে যাই।"

সশিষ্য ঋষি সন্দীপন সেই ভাঙ্গা আলির নিকটে উপস্থিত হইয়াও আরুণিকে দেখিতে পাইলেন না। আরুণির সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছে; বহুক্ষণ সেই জলাভূমিতে শায়িত থাকায় তাঁহার হস্তপদ অসাড় হইয়া গিয়াছে, নিশ্বাস-বায়ুও অতি ধীরে প্রবাহিত হইতেছে।

ঋষি সন্দীপন ডাকিলেন "বৎস আরুণি! তুমি কোথায়? শীঘ্র আমার নিকট এস!" তখন আরুণি অতি কষ্টে সেই কর্দ্দম-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইলেন। সেই মুহূর্ত্তে ভাঙ্গা আলির মুক্ত-পথে উচ্ছ্বসিত জলস্রোত প্রবেশ করিয়া সকলের পদস্পর্শ করিল।

সবিস্ময়ে আচার্য্য বলিলেন "একি! তুমি ওখানে কি করিতেছিলে?" আরুণি তখন অনুপূর্ব্ব বিবরণ গুরুদেবকে নিবেদন করিলেন। ইহা শ্রবণে সকলে অতিশয় মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। সস্নেহে আরুণিকে আলিঙ্গন করিয়া ঋষি সন্দীপন বলিলেন, "বৎস! আমি তোমার আশ্চর্য্য গুরুভক্তি ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি অচিরে সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হও।"

দীনের গৌরব।

রাজ্য লইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কুরুরাজ দুর্য্যোধনের মধ্যে বিবাদ আসন্ন হইয়া আসিলে, উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে এই শোচনীয় ভ্রাতৃবিরোধ না ঘটে, তাহার চেষ্টা করিবার জন্য হস্তিনাপুরে কুরুরাজ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শান্তি-প্রিয় যুধিষ্ঠির অধিক প্রত্যাশা রাখিতেন না, তিনি তাঁহার বিশাল পৈতৃক-রাজ্য হইতে পঞ্চ ভ্রাতার নিমিত্ত পাঁচখানি মাত্র গ্রাম

প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ঐশ্বর্য্যদৃপ্ত দুর্য্যোধন তাহাতেও প্রতিবাদী হইলেন।

কুরুরাজের সভার সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয় ; তাহাতে আজ আবার শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও শক্তি দেখাইবার জন্য আড়ম্বরের সীমা ছিল না। পিতামহ ভীষ্ম, অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ দুর্য্যোধন, অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্য্য, মহাবীর কর্ণ প্রভৃতি সকলে আপন আপন পদোচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, বিশ্ববরেণ্য শ্রীকৃষ্ণের জন্যও রত্ন-বিমণ্ডিত পৃথক স্বর্ণসিংহাসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

যথারীতি কুশল-সম্ভাষণাদির পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আগমনের কারণ দুর্য্যোধনকে জানাইলেন, বলিলেন, শান্তি-প্রিয় যুধিষ্ঠির ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সমগ্র কুরুরাজ্যের অধীশ্বর হইলেও তিনি স্বীয় কুল-ক্ষয়কারী ভ্রাতৃদ্রোহ ইচ্ছা করেন না, তিনি সামান্য পাঁচ-খানি মাত্র গ্রামের প্রত্যাশী, তাহাই তাঁহাকে দেওয়া হউক। ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ যে সকল ধর্ম্মাত্মা সভাসদ্ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই একবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সাধুবাদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ইহা রক্ষা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ মহারাজ দুর্য্যোধনকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মহারাজ দুর্য্যোধন তাঁহার প্রিয় সখা কর্ণ ও মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সগর্ব্বে উত্তর দিলেন—

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী!"

অর্থাৎ পাঁচ খানি গ্রাম তো বহু দূরের কথা, একটী সূচীর অগ্রভাগে যেটুকু মাটি ধরে, তিনি সেটুকুও বিনাযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে দিবেন না।

শত চেষ্টাতেও কেহ তাঁহার এই দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারিলেন না, সকলেই কুরুকুলের ভীষণ পরিণাম ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ব্যর্থমনোরথ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে সভা-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। সহস্র অনুরোধ উপরোধেও কেহ তাঁহাকে রাজপুরীর আতিথ্য স্বীকার করাইতে পারিল না।

নগরের উপকণ্ঠে পরম ধর্ম্মপরায়ণ বিদুরের ক্ষুদ্র কুটীর। তিনি মহারাজ দুর্য্যোধনের খুল্লতাত ও রাজ্যের অন্যতম প্রধান অমাত্য হইলেও পার্থিব-বিভব গ্রাহ্য করিতেন না। ভিক্ষান্নই তাঁহার উপজীবিকা। যে যুগে ভীষ্মের ন্যায় মহাত্যাগী এবং যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পুণ্যভূমি ভারতের সেই পুণ্যযুগেও বিদুরের মত ত্যাগী ও ধার্ম্মিক পুরুষ অতিশয় দুর্ল্লভ ছিল। তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের একান্ত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং তাঁহাকে আশৈশব অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য, দম্ভ ও অভিমানপূর্ণ রাজ-সভা হেলায় পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্র বিদুরের শান্তিময় কুটীরে সম্পূর্ণ অনাহূত ভাবে সাগ্রহে উপনীত হইলেন। মহাত্মা বিদুর তখন ভিক্ষার্থ নগরে গিয়াছিলেন। ভগ্নী কুন্তী ও বিদুর-পত্নী শ্রীকৃষ্ণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সত্য বটে, এ কুটীরে ধনের গৌরব, বা লৌকিক সৌজন্য, বা অভ্যর্থনার ছদ্মবেশ ছিল না ; কিন্তু এই কুটীরবাসীগণের হৃদয়ে পুণ্য, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও মমতার যে অমৃত উৎস সর্ব্বদা উছলিয়া উঠিত, তাহা সমগ্র বসুধাকে প্লাবিত ও সঞ্জীবিত করিতে পারিত। এ আকর্ষণ

ছিন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দূরে থাকিবার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন সময় দ্রুতপদে বিদুর উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও বন্দনা করিলেন এবং তিনি যে ধনীর রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে উপনীত হইয়াছেন, তজ্জন্য বহু আনন্দ জানাইতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "বিদুর! এখন তোমার লৌকিকতা রাখ। আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি, তোমার গৃহে যদি কিছু আহার্য্য থাকে, তবে শীঘ্র আমাকে দাও।" বিদুর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "প্রভো! আমার অবস্থা তো আপনার অবিদিত নাই। ভিক্ষাই আমার সম্বল। আমার গৃহে আহার্য্য কোথা হইতে থাকিবে? আজ আমি ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করা মাত্র শুনিলাম, আপনি এ দীনের কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, তাই আমি ভিক্ষা ফেলিয়া আপনাকে দেখিবার জন্য দ্রুত ছুটিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই ভিক্ষা করিয়া লইয়া আসিতেছি।"

লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "বিদুর! অতটা বিলম্ব আমি সহ্য করিতে পারিব না। তুমি তোমার ঐ ভিক্ষা ঝুলি অন্বেষণ করিয়া দেখ। সেখানে যাহা পাও, তাহাই আমাকে দাও।" বিদুর অগত্যা তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি খুঁজিয়া দেখিলেন, কিন্তু সেখানে একটী ক্ষুদ্র তণ্ডুলের কণা ব্যতীত আর কিছুই পাইলেন না। সেই ক্ষুদটুকু হাতে লইয়া বিদুর বলিলেন,

"দেব! এ সামান্য ক্ষুদ ভিন্ন তো এখানে আর কিছু নাই!" হাসিমুখে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "বন্ধু! তাহাই আমাকে দাও, তাহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে।"

ভারতের কত রাজরাজেশ্বর যাঁহার চরণতলে আপনাদের রাজৈশ্বর্য্য ও দেহমনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন, বিশাল ভারতে যাঁহার গৌরব ও সম্মানের সীমা ছিল না, সেই যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুদ্র শিশুটীর মত সেই সামান্য ক্ষুদটুকুর জন্য ভক্ত বিদুরের নিকট হাত পাতিলেন, এবং তাহা আহার করিয়া স্মিতকণ্ঠে বলিলেন, "সখা বিদুর! সত্য বলিতেছি, আমি আজ তোমার প্রদত্ত এই ক্ষুদে যেরূপ অপরিসীম পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম, শত রাজভোগেও এমন আর কখনও পাই নাই! তোমার এ অমৃততুল্য ক্ষুদের নিকট সকল রাজ-ভোগ অতি তুচ্ছ।"

মহাপ্রাণ বিদুর সেই মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন এবং পবিত্র প্রেমাশ্রুতে তাঁহার পাদপদ্মযুগল অভিষিক্ত করিয়া বাষ্পাকুল গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন, "প্রভো! এতক্ষণে বুঝিলাম তুমি প্রকৃত ক্ষুধিত নও, দীনের গৌরব বাড়াইবার জন্যই তোমার এ চাতুরী!" নিমেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উঠাইয়া সুনিবিড় ভুজপাশে বন্ধন করিলেন।

কোন্ অতীত যুগান্তের এ অপূর্ব্ব কাহিনী! কিন্তু এখনও যখন ভক্ত দেবতার চরণে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেন, তখন বলেন, "হে দীন-বৎসল ভগবন্! তুমি কৃপা করিয়া এই 'বিদুরের ক্ষুদ' টুকু গ্রহণ কর।"

টাইট্যানিকের শিক্ষা।

মানুষের অন্তঃকরণে যে অলৌকিক শক্তি লুকান আছে, অনেক সময়ে সম্পদ অপেক্ষা বিপদের ভিতরেই তাহার বেশী পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্ণ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তেমনি বিপদের আগুণ মানুষকে সন্তপ্ত করিয়া তাহার ভিতরের মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলে; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "টাইট্যানিক" জাহাজডুবিতে আমরা বিশেষ ভাবে সেই শিক্ষা পাইয়াছি।

শুধু তাহাই নহে। আমরা উক্ত দুর্ঘটনায় ইহাও দেখিতে পাইয়াছি, ক্ষুদ্র মানুষের সকল জ্ঞানগরিমা, সকল দর্প-অভিমান বিধাতার দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছার নিকট কত নগণ্য—কত তুচ্ছ! আমাদের এই যে শিক্ষা—আমাদের এই যে অভিজ্ঞতা, ইহা আমাদের ঘোর অমঙ্গলের মধ্যে পরম দেবতার মঙ্গল-দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

"টাইট্যানিক" নামক জাহাজখানি ইংলণ্ডে প্রস্তুত হইয়াছিল। মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধিতে যতদূর সম্ভব ইহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষার উপযোগী করিয়া এবং পার্থিব সকল প্রকার সুখস্বচ্ছন্দতার আকরস্বরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করা গিয়াছিল। ইহা দেখিয়া সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন, এমন সুন্দর ও বৃহৎ জাহাজ পৃথিবীতে আর নাই। ইহার নির্ম্মাতারা অহঙ্কার করিয়া

বলিয়াছিলেন, "সোলা জলে ডুবিয়া যাওয়া সম্ভব, কিন্তু টাই-ট্যানিক জলে নিমজ্জিত হওয়া কখনও সম্ভব নয়।" তখন কে জানিত যে কয়েক দিন পরেই তাঁহাদের এই অহঙ্কারে নিয়তি কি নিদারুণ পরিহাস করিবেন ?

ইংলণ্ডের রাণী মেরী টাইট্যানিক প্রথম জলে ভাসাইবার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। টাইট্যানিক ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু বিখ্যাত ধনী ও জ্ঞানী ভদ্রলোক ইহার আরোহী হইয়াছিলেন। শত শত কণ্ঠের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে টাইট্যানিক অগ্রসর হইল এবং নানাস্থানের সহস্র সহস্র অধিবাসী সমবেত হইয়া তাহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল।

টাইট্যানিক ১৯১২ সালের ১০ই এপ্রিল ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করে ; আশা ছিল, ১৭ই এপ্রিল আমেরিকায় পৌঁছিবে। ১৪ই এপ্রিল দিনের বেলা পর্য্যন্ত বেশ নিরাপদে কাটিয়া গেল। আরোহীগণ নানারূপ আমোদ আহ্লাদে, ক্রীড়া-কৌতুকে, গল্প-গুজবে, বেশ মনের আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতেন। টাই-ট্যানিকে কিছুরই অভাব নাই—কিছুরই ভাবনা নাই। সুখ-সম্ভোগের সকল উপাদান এখানে সংগৃহীত হইয়াছে; তারপর এক টুকুরা সোলা ডুবিতে পারে, তবু টাইট্যানিক কখনও ডুবিতে পারে না ! নীল সমুদ্রের অতুলন সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া টাইট্যানিক সগর্ব্বে নিশান উড়াইয়া হেলিয়া দুলিয়া ছুটিয়াছে !

এমনি আরামে—এমনি নিশ্চিন্ত মনে ১৪ই এপ্রিল রাত্রিতে আরোহীগণ আহার করিয়া আপন আপন কক্ষে গিয়াছেন, কেহ

বা ধূমপান করিতেছেন, কেহ তাস খেলিতেছেন, কেহ বা সঙ্গীত করিতেছেন। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথি, সমুদ্র শান্ত, ঊর্দ্ধে অগণ্য নক্ষত্র খচিত অনন্ত আকাশ, নিম্নে আটলাণ্টিকের স্থির বারিরাশি তাহার প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বচ্ছ-দর্পণের ন্যায় দিগন্তে প্রসারিত। এমন সময় টাইট্যানিকের কাপ্তেন অগ্রগামী কোন জাহাজের নিকট হইতে তারহীন টেলি-গ্রাফে সংবাদ পাইলেন, "সম্মুখে তুষার শৈল, সাবধান হও।"

টাইট্যানিক অতি দ্রুতবেগে সম্মুখের পানে ছুটিতেছিল। কাপ্তেন সতর্ক হইতে না হইতেই সেই ভাসমান তুষার শৈলের সহিত ভীষণ সংঘর্ষে জাহাজের সম্মুখভাগ বিদীর্ণ হইয়া গেল; জাহাজের গতি স্থগিত হইল, অল্পক্ষণের মধ্যেই বিপদসূচক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তে সকলের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিতে উদ্‌গ্রীব হইলেন।

এই ভীষণ বিপদের সময় টাইট্যানিকের কাপ্তেন, নাবিক ও কর্ম্মচারিগণ যে অলৌকিক বীরত্ব, অপরিসীম ধৈর্য্য, অকুণ্ঠ সাহস ও অমানুষিক কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিলেন, তাহা বাস্তবিকই জগতের নিকটে তাঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় ও চির-বন্দনীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কাপ্তেন স্মিথ যখন বুঝিলেন আর রক্ষা নাই, মৃত্যুর ভৈরব হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের সকলকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তখন তিনি ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন না। তিনি নিমেষে আপনার কর্ত্তব্য বুঝিয়া স্থির ও ধীরভাবে তাহা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কাপ্তেনের আহ্বানে আরোহীগণ ডেকের উপরে একত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও এই মহামুহূর্ত্তে, জীবন-মৃত্যুর এই মহাসন্ধিস্থলে, আত্মজীবন রক্ষার্থ কিছুমাত্র অধীরতা প্রকাশ করিলেন না। যাহাতে বালকবালিকাগণ ও স্ত্রীলোকেরা রক্ষা পান, সে বিষয়ে সকলেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সে দিন টাইট্যানিকে আরোহী ও নাবিকে মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৪০ জন লোক ছিল। কিন্তু যে জীবন-তরী বা জালি-নৌকা ছিল তাহাতে ৯০০ লোকের অধিক ধরে না। জীবন-তরীগুলি শিশু ও স্ত্রীলোকে পূর্ণ করিয়া সেই অসীম সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। কত স্বামী হইতে স্ত্রীকে, পিতা হইতে কন্যাকে, ভাই হইতে ভগ্নীকে, পুত্র হইতে মাতাকে ছিনাইয়া লওয়া হইল। অনেক স্ত্রীলোক স্বামীকে ছাড়িয়া নৌকায় উঠিতে কিছুতেই স্বীকৃতা হইলেন না। তাঁহারা পতির সহিত সহমৃতা হইবেন পণ করিয়া দৃঢ়ভাবে রহিলেন, নাবিকেরা কিছুতেই তাঁহাদিগকে পতির পার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না।

এরূপে সকল কর্ত্তব্য যখন শেষ হইল, তখন সেই নিমজ্জমান জাহাজের বাকী আরোহী ও কর্ম্মচারীগণ শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইয়া ঈশ্বরের চরণে শেষ প্রার্থনা করিলেন, নাবিকগণ সুমধুর বাদ্যযন্ত্রযোগে আবেগ-বিহ্বল-কণ্ঠে প্রার্থনা সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন।

সেই সঙ্গীতধ্বনি দিগন্তে মিলাইবার পূর্ব্বেই উদ্বেলিত মহাসাগর টাইট্যানিকের এই মহাপ্রাণদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। মানুষ বুঝিল, তাহার অহঙ্কার যেখানে, সেখানে কত

দীনতা! আর যেখানে ভগবানে আত্মসমর্পণ, সেখানে কত মহত্ত্ব, কত শান্তি!

ধূলার আশ্চর্য্য কাজ।

তোমাদের ভিতর কলিকাতায় যাহাদের বাড়ী, তাহাদিগকে ধূলার উপদ্রব খুব ভোগ করিতে হয়। ফরসা কাপড় পরিয়া একদিন রাস্তায় বাহির হও, পরদিন দেখিবে, তাহা ময়লা হইয়া আসিয়াছে। রোজ দুই তিন বার না ঝাড়িলে ঘরের জিনিস পত্র পরিষ্কার রাখা যায় না। পাড়াগাঁয়ে বাতাসে এত ধূলা নাই, কারণ সেখানে দিনরাত এত গাড়ীঘোড়া চলে না। সেইজন্য সহর অপেক্ষা পাড়াগাঁয়ের বাতাস ভাল লাগে। ইহা ভিন্ন এই ধূলি আমাদের শরীরে নানা প্রকারে অনিষ্টসাধন করে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ধূলির ঝড়ে ধূলা লাগিয়া কত লোকের চোখের অসুখ হয়, এমন কি, কত লোকের চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আবার এই ধূলি নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত আমাদের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে, মুখের ভিতর দিয়া আমাদের পেটে যায় এবং সেখানে নানাপ্রকার পীড়া উৎপাদন করে।

ধূলিকণা কি রকম অনিষ্টজনক, তাহা ত বলিলাম; কিন্তু তোমরা কি ভাবিতে পার যে, এই ধূলার আবার সংসারে বিশেষ কাজ আছে? একবার ভাব দেখি যে, এই সামান্য ধূলিকণা

লইয়া জগতের স্রষ্টা কত পরম সুন্দর সুন্দর দৃশ্য রচনা করেন, কত আশ্চর্য্য কাজ এই ধূলিকণাদ্বারা করাইয়া লন। তোমরা কি জান যে, সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব শোভা এই সামান্য ধূলিকণারই কাজ! আকাশ এবং সমুদ্রের জল যে নীল দেখায় তাহাও এই ধূলিকণারই জন্য! কি করিয়া যে এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার হয়, তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি ঃ—

বায়ুমণ্ডল পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধে প্রায় একশত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, তাহা এই ধূলিকণায় পূর্ণ। গৃহের জানালার ঝিলমিলের ভিতর দিয়া যখন প্রাতঃকালে সূর্য্যরশ্মি অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করে, তোমরা দেখিয়া থাকিবে, তাহার ভিতর কত অসংখ্য ধূলিকণা ভাসিতেছে। ধূলার মধ্যে হাল্‌কা ধূলা এবং ভারী ধূলা আছে ; সূক্ষ্ম এবং হাল্‌কা ধূলা উচ্চস্তরের বাতাসে থাকে, ভারী ধূলাসকল নিম্নস্তরের বাতাসে থাকে।

পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ধূলিবিহীন বায়ুর ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি প্রবেশ করাইলে, সে স্থান আলোকময় না হইয়া অন্ধকারই দেখায়। পরে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ধূলিকণা অল্প পরিমাণে সেই বায়ুতে প্রবেশ করাইলে, সে স্থান একেবারে অন্ধকার না হইয়া নীলাভ আলোকময় দেখায়। আরও মোটা ধূলা যদি ঐ বায়ুতে প্রবেশ করান যায়, তখন নীল রং ঘুচিয়া ক্রমশঃ সাদা রং দেখা দেয়। যাঁহারা বেলুনে করিয়া আকাশে গিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, যত উচ্চে যাই, আকাশ ততই আরও গাঢ় নীল ; তাহার কারণ এই যে যতই উচ্চে উঠা যায় ততই মোটা ধূলা ছাড়াইয়া সূক্ষ্ম ধূলিকণার ভিতর গিয়া পড়িতে

হয় ; এবং সূক্ষ্ম ধূলার ভিতর দিয়া আকাশ ক্রমেই অধিক নীলবর্ণ দেখায়।

তোমরা মাথার উপরের আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে ঐ আকাশ কেমন নীল। কিন্তু নিম্ন ভাগের আকাশের দিকে চাও, দেখিবে সে আকাশ তেমন নীল নহে, ইহার কারণও সেই ধূলিকণা। নিম্ন ভাগের আকাশের দিকে চাহিতে হইলে আমাদের দৃষ্টি নিম্নভাগের ধূলিকণার ভিতর দিয়া অনেকটা পরিমাণে যায় ; এবং এই নিম্নভাগের ধূলিকণাগুলি ভারী ও মোটা ; সেই জন্য মোটা ধূলার ভিতর দিয়া আকাশ সাদা দেখায়. নীলবর্ণ দেখায় না। কিন্তু মাথার উপরকার আকাশের দিকে চাহিতে হইলে যে ধূলার ভিতর দিয়া আমাদের দৃষ্টি চালাইতে হয় সে ধূলা ক্রমশঃ হাল্কা ও সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে ; সুতরাং সেই ধূলির ভিতর দিয়া আকাশ খুব নীলবর্ণ দেখায়।

তোমরা দেখিয়াছ সকালে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশে কেমন সুন্দর শোভা হয়। ইহাও তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি।

তোমরা জান সূর্য্যালোকের রং সাদা ; কিন্তু সাদা বলিয়া কোনও পৃথক রং নাই। রামধনুতে যে সাতটী রং দেখা যায় সেই রং-গুলি একত্র মিশাইলে সাদা রংএর সৃষ্টি হয়। সূর্য্যের যে আলো তাহাও ঐ সাত রংএর সমষ্টি। ঐ সূর্য্যের কিরণ যখন আমাদের নিকট আসে, তখন তাহাকে ধূলিকণার ভিতর দিয়া আসিতে হয়। ঐ ধূলিকণাগুলি সেই সময়ে সূর্য্যের কিরণ হইতে কিছু কিছু রং আদায় করিয়া লয়। যেগুলি সূক্ষ্ম ধূলিকণা

তাহারা বেশী রং কাড়িয়া লইতে পারে না ; কিন্তু যেগুলি মোটা ধূলি তাহারা সূর্য্যের আলো হইতে নানা রং যথাসাধ্য আত্মসাৎ করে। সকালে এবং বিকালে সূর্য্যের কিরণ নিম্নভাগের মোটা ধূলার মধ্য দিয়া আসে ; এবং আসিবার সময় মোটা ধূলাগুলি সূর্য্যকিরণের কতকগুলি রং কাড়িয়া লয় এবং কতকগুলি ছাড়িয়া দেয় ; সেই সকল রং আকাশের গায়ে নানাপ্রকার শোভা ধরে। কিন্তু মধ্যাহ্নের সূর্য্যকিরণ উপরিভাগের ধূলিকণার ভিতর দিয়া আসে ; তাহারা কিছুই লইতে পারে না ; সেই জন্য দ্বিপ্রহরে আকাশের গায়ে রং‌এর শোভা হয় না।

আমরা সকালে এবং সন্ধ্যায় সূর্য্যের দিকে চাহিতে পারি, কিন্তু দ্বিপ্রহরে পারি না ; ইহার মূলেও সেই ধূলিকণা। সকালের এবং সন্ধ্যার সূর্য্যকিরণ হইতে মোটা ধূলিকণাসমূহ অনেক রং কাড়িয়া লয় বলিয়া আলোকের তেজ কমিয়া যায়, সেই জন্য সূর্য্যের দিকে চাহিতে আমাদের কোনও কষ্ট হয় না ; কিন্তু মধ্যাহ্নের সূর্য্যের কিরণ হইতে সূক্ষ্ম ধূলিকণা সমূহ কিছুই লইতে পারে না বলিয়া সূর্য্যের তেজ যেমন তেমনই থাকে, সেই জন্য সূর্য্যের দিকে চাহিতে গেলে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়।

সামান্য ধূলিকণা হইতে সূর্য্যের তেজের কিরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, রং‌এর কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, এবং আকাশে নানা রং‌এর কিরূপ অপূর্ব্ব শোভা হয় তাহা এখন বুঝিলে ?

চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

চট্টগ্রামে যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান এই চারিটী মহাধর্ম্মের একত্র সমাবেশ ঘটিয়াছে, এ স্থান যেমন যুগে যুগে এই চারিটী মহাধর্ম্মাবলম্বী কত ভক্ত, প্রেমিক ও কবিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে, তেমনি এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অত্যন্ত মনোরম—এখানে একাধারে সাগর, নদী, পর্ব্বত, বন, নির্ঝর, উৎস প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃতিরাণী যেন তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া চট্টগ্রামকে সর্ব্বদা নানা সাজে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

কোকিল যদি বসন্তের সহচর হয়, তবে চট্টগ্রামে চির-বসন্ত বিরাজমান। এখানে বার মাসেই কোকিলের সুমধুর কণ্ঠ শুনা যায়। "বউ কথা কও," দয়েল, শ্যামা, পাপিয়া, ফিঙ্গে, টিয়া, কুরর, ঘুঘু প্রভৃতি কত রকম পাখী সর্ব্বদা কোকিলের সুরে বিচিত্র সুর মিলাইয়া থাকে।

চট্টগ্রামে অনেক ছোট ও বড় পাহাড় দেখা যায়। তন্মধ্যে "চন্দ্রনাথ" পর্ব্বত ভারত বিখ্যাত। এইখানে মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৭৩৩ সাত শত তেত্রিশ হাত উচ্চ। এখান হইতে চারিদিকের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের সুনীল ফেনিল জলরাশি গভীর গর্জ্জনে সহস্র তরঙ্গ তুলিয়া চন্দ্রনাথ শৈলাভিমুখে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। নিম্নে পৃথিবীর বুকে অগণিত তড়াগ ও

দীর্ঘিকা প্রবালবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে, পর্ব্বতজাত নদীগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আনন্দে 'কুলু' 'কুলু' তানে নাচিয়া নাচিয়া সাগরাভি-মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বদিকে সারি সারি কুসুমিত তরু-লতা পরিবেষ্টিত, শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিশোভিত পল্লীগ্রামগুলি এক খানি সুন্দর চিত্রের মত শোভা পাইতেছে। উত্তরে তরঙ্গায়িত শৈলশ্রেণী অনন্তকাল ধরিয়া সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দক্ষিণে মহেশখালির শৈলখণ্ড অতল সিন্ধুগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মুকুট-মণির ন্যায় দেবাদিদেব "আদিনাথ"কে ধারণ করিয়াছে। সমগ্র চন্দ্রনাথ বিবিধ বন-ফুলে সমাচ্ছাদিত ও অজস্র পাখীর গানে মুখরিত।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের রাজধানী "রাঙ্গামাটি"ও বড় সুন্দর। ইহার তিন দিকে নদী বহিয়া যাইতেছে, আর এক দিকে দিগন্ত-প্রসারিত পর্ব্বত-মালা শোভা পাইতেছে। কোন কোন পাহাড়ের গায় মায়ের কোলে ক্ষুদ্র শিশুটীর মত তুষারশুভ্র মেঘগুলি ঘুমাইয়া রহিয়াছে! মাঝে মাঝে চঞ্চল বাতাস তাহাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে! বর্ষার পর কিছুকাল আর এই ঘুমন্ত-মেঘ-মালা দেখা যায় না; সে সময় সেই পাহাড়গুলির দিকে তাকাইলে মনে হয়, পর্ব্বত-জননী যেন আপন সন্তানদিগকে জগতের কাজে বিলাইয়া দিয়া তাহাদের মঙ্গল-চিন্তায় একান্তে ধ্যান-নিমগ্না রহিয়াছেন!

চট্টগ্রামের অধিকাংশ পর্ব্বতই অরণ্যবহুল; এ সকল অরণ্যে অসভ্য পার্ব্বত্য-জাতির সঙ্গে তাহাদের প্রতিবেশীরূপে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, বানর, হরিণ, সর্প প্রভৃতি বাস করিয়া

থাকে। কোন কোন পাহাড়ের বিশাল দেহ পরিবেষ্টন করিয়া স্তরে স্তরে পথশ্রেণী নিবিড় অরণ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। কেহ হয়ত উপরের রাস্তায় বেশ রৌদ্রে বেড়াইতেছেন, এদিকে নীচের পথিকেরা অজস্র বৃষ্টি-ধারায় সিক্ত হইতেছেন! রৌদ্র-বৃষ্টির এ খেলা কত সুন্দর, না দেখিলে ঠিক বুঝান যায় না।

কোন সমুন্নত গিরি-শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে বৃক্ষ, গুল্ম, গৃহ, পুষ্করিণী ইত্যাদি সমস্তই এক সমান বোধ হয়। সেইরূপ যাঁহারা জগতে জ্ঞানে ও গুণে, চরিত্রে ও ধর্ম্মে উন্নত হয়েন, তাঁহাদের চক্ষে আর ছোট-বড় ভেদাভেদ থাকে না—সকলকেই সম-ভাবে উদার হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। কে ধনী, কে দরিদ্র, কে পণ্ডিত, কে মূর্খ, ইহা বিচার করিয়া কখনও তাঁহাদের প্রীতির ন্যূনাধিক্য ঘটে না।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কিছু দূরে "বাড়বকুণ্ড" ও "সহস্রধারা" নামক দুইটী আশ্চর্য্য দেখিবার জিনিষ আছে। আমরা জানি জলে আগুন নিভান যায়। "বাড়বকুণ্ডে" সেই জলের বুকেই সর্ব্বদা ধূ ধূ করিয়া আগুণ জ্বলিতেছে! জলের বুকে যে আগুণ জ্বলে, তাহাকে বাড়বানল বলে। এই বাড়বানলটী বিজন অরণ্যে অবস্থিত। চারিদিকে কাননের নিস্তব্ধতার মধ্যে বাড়বানলের হুহুঙ্কারের সহিত নির্ঝরের কল কল শব্দ মিশিয়া যেন এক বিচিত্র সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছে।

"সহস্রধারা" একটী অপূর্ব্ব জলপ্রপাত বা নির্ঝরিণী। ইহা তিনশত ফিটেরও উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে তলস্থ শিলাখণ্ডে বর্ষার বারিধারার ন্যায় অজস্র ধারে পতিত হইতেছে। সহস্রধারার

চারিদিক শৈল প্রাচীরে আবৃত। মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্যের ক্ষীণ রশ্মি একটু দেখা দিয়াই আবার অমনি অন্তর্হিত হইয়া যায়। সহস্রধারার ঝর ঝর নিনাদের সঙ্গে ঝিল্লীর ঐক্যতান ও পাখীর মিষ্ট গান মিলিত হইয়া স্থানটীকে সর্ব্বদা অপার্থিব সৌন্দয্যে বিভূষিত ও সঙ্গীতে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্বতন আর্য্যঋষিগণ প্রকৃতির নিরূপম সৌন্দর্য্যের ভিতরে সকল সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা ও সকল সৌন্দর্য্যের আধার বিধাতা পুরুষকে অন্বেষণ করিতে ও অর্চ্চনা করিতে ভাল বাসিতেন। তাই যখন তাঁহারা যেখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন, তখনই সে স্থান তাঁহাদের তপস্যাভূমিতে কিংবা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিতেন। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ, বাড়বকুণ্ড ও সহস্রধারা সেই আর্য্যঋষির অমিত তপঃপ্রভাবে এবং পবিত্র চরণ-ধূলি-স্পর্শে স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুগণের মহাতীর্থে পরিগণিত হইয়াছে। এখনও সহস্র সহস্র নরনারী এখানে সমবেত হইয়া ভক্তির অর্ঘ্য রচনা করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত তীর্থগুলি ব্যতীত হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের আরও বহুতীর্থ চট্টগ্রামে আছে। তন্মধ্যে হিন্দুর আদি-নাথ ও মেধস আশ্রম, বৌদ্ধের মহামুনি এবং মুসলমানের বাজিদ বোস্তামি প্রভৃতি পুণ্যভূমির প্রাকৃতিক সংস্থানও বড় মনোরম।

চট্টগ্রামের স্বভাব শ্যামল বক্ষকে সরস ও উর্ব্বরা করিয়া কর্ণফুলী, শঙ্খ, মুরলা, চান্দখালী, মুহুরী, ফেণী প্রভৃতি নামে অভিহিত বহু নদনদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে কর্ণফুলী নদী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার অপর নাম "কাঞ্চী"; ইহার

উৎপত্তি স্থান নীল পর্ব্বতমালা। কর্ণফুলী ধর্ম্ম-পরায়ণ হিন্দুদের নিকটে একটী পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী।

এ দেশের নানা স্থানে অনেক উৎস দেখা যায়, স্থানে স্থানে যেন ধরিত্রী মাতার বক্ষ ভেদ করিয়া স্নিগ্ধ স্নেহ-সুধা স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে! ইহাদের মধ্যে যেগুলি অধিবাসিগণ ইষ্টকাদিদ্বারা বাঁধাইয়া আপনাদিগের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইয়াছেন, সেগুলি সাধারণতঃ "মৎসঝরণা" "শীতল ঝরণা" ইত্যাদি নামে খ্যাত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া এখানে রৌদ্র ও ছায়ার এক অপূর্ব্ব খেলা প্রায়ই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন পর্ব্বত-শীর্ষে দাঁড়াইলে দেখিতে পাইবে, নিম্নে তোমার সম্মুখের প্রসারিত ভূমি কিয়দংশ রৌদ্রে, কিয়দংশ ছায়ায়, আবার কিয়দংশ রৌদ্রে, কিয়দংশ ছায়ায়, এইরূপ স্তরে স্তরে রৌদ্র ছায়ায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে, বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এ দৃশ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যেখানে রৌদ্র ছিল, সেখানে ছায়া, আবার যেখানে ছায়া ছিল, সেখানে রৌদ্র বিরাজ করিতেছে। এমনি ভাবে যেন রৌদ্রছায়া দুইটী ভাইবোন পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া পৃথিবীর বুকে আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতেছে।

চট্টগ্রাম সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। সমুদ্রবক্ষে কুতবদীয়া, সন্দীপ, কুমারী, আদিনাথ প্রভৃতি বহু দ্বীপপুঞ্জ দৃষ্ট হয়। সমুদ্রের উদার গম্ভীর দৃশ্য যেমন অনির্ব্বচনীয়, তেমনি সমুদ্রে সূর্য্যাস্তও একটী পরম রমণীয় দর্শনীয় পদার্থ।

চট্টগ্রামের নিরুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধেরা ইহাকে রম্যভূমি, আরবেরা "সহর সব্‌জে" অর্থাৎ সবুজবর্ণ সহর, এবং ত্রিপুরেরা শ্যামল নগর বলিতেন। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে ইহা চৈত্যগ্রাম নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এক সময়ে এখানে অনেক চৈত্য অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মমন্দির বা বিহার ছিল। পর্ত্তুগীজেরা যখন এখানে বাণিজ্য করিতে আসেন, তখন তাঁহারা এদেশের নাম "পোর্টো গ্রাণ্ডো" অর্থাৎ প্রধান বন্দর রাখেন।

যে দেশ এত সুন্দর, যেখানে ব্যবসা বাণিজ্যের এত সুবিধা সেখানে যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজার লোলুপ-দৃষ্টি পড়িবে, তাহার আর সন্দেহ কি? এক সময়ে চট্টগ্রাম ত্রিপুরার হিন্দু-রাজগণের অধীন ছিল, তারপর আরাকাণের বৌদ্ধ রাজারা এ দেশ অধিকার করেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম লইয়া ত্রিপুরার হিন্দু রাজা, আরাকাণের বৌদ্ধ রাজা এবং বাঙ্গালার মুসলমান রাজা পরস্পর মহাসমরে প্রবৃত্ত হয়েন; এই যুদ্ধে প্রজাদের বহু আত্মীয় স্বজন, ধনসম্পদ, ও শস্যরাজি বিনষ্ট হইয়াছিল। ফলে চট্ট-গ্রামের শান্তিকুঞ্জও তাহাদের হাহাকারে পূর্ণ হইল।

যাহা হউক, মুসলমানগণ এই মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং ইহার নাম "ইসলাম আবাদ" রাখেন। ইসলাম অর্থে শান্তি (ঈশ্বরের অপর নাম), আর আবাদ অর্থে নগর, সুতরাং ইস্‌লাম আবাদ অর্থে "ঈশ্বরের শান্তিময় নগর" বুঝাইতেছে। এই 'ঈশ্বরের শান্তিময় নগরের" প্রভুত্ব ১৬৮৬

খৃষ্টাব্দে মুসলমান সম্রাটের সহিত সন্ধি-সূত্রে ইংরাজেরা প্রাপ্ত হয়েন।

প্রকৃতির রঙ্গভূমি চট্টগ্রামকে শুধু মানুষের হাতে নয়, সময়ে সময়ে প্রকৃতির হাতেও বিষম অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রবল ঝড়ে ও শিলাবৃষ্টিতে এখানকার প্রায় সমস্ত গৃহ ও বৃক্ষাদি একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছিল এবং সহস্র সহস্র নরনারী ও পশুপক্ষী প্রাণ হারাইয়াছিল। সমুদ্র সন্নিহিত স্থানগুলি একেবারে জলে ডুবিয়া গিয়াছিল এবং দ্বীপপুঞ্জে একটি প্রাণীও রক্ষা পায় নাই। জল-স্থল একাকার হইয়া সর্ব্বত্র অনন্ত সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। সেই অসীম সলিলোচ্ছ্বাসে শত শত অসহায় নরনারী, পশুপক্ষী, তরুলতা ভাসিয়া যাইতেছিল। চারিদিকের করুণ আর্ত্তনাদ মুহুর্মুহু চপলার অট্টহাসিতে ও বজ্রের ভীষণ নির্ঘোষে ডুবিয়া যাইতেছিল। জলে স্থলে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! চির স্নেহময়ী প্রকৃতি রাণী যেন সেদিন সংহার মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিকট দানবী-সজ্জা চট্টগ্রামবাসী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আর একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেবারও এমনি প্রবল ঝটিকা—মৃত্যুর এমনি করাল অভিনয় হইয়াছিল।

বিপদ কখনও একেলা আসে না। প্রত্যেকবারই ঝড়ের পর এদেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিয়াছিল। ইহাতেও অনেক লোক বিনষ্ট হয়। যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদেরও কষ্টের সীমা ছিল না। কিন্তু প্রথমবার ঝড়ের পর চট্টগ্রামের সাধারণ স্বাস্থ্য যেরূপ খারাপ হইয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয়বার ঝড়ের

কিছুকাল পরেই তাহার তেমনি সমধিক উন্নতি ঘটে। চট্টগ্রামবাসী এখনও সে স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিতেছেন। ঘোর অমঙ্গলের ভিতর দিয়া মঙ্গলময় বিধাতা বুঝি এমনি ভাবে সর্ব্বদা জগতের কল্যাণ সাধন করেন।

চট্টগ্রামে ১৭৬২, ১৮৬৫ এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়া প্রতিবারেই এদেশের অট্টালিকাদির অল্পবিস্তর ক্ষতি করিয়াছে! ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এদেশে একদা অহোরাত্রে একুশবার ভূমিকম্প হয়, এই কম্পনের ফলে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের একস্থান বিদীর্ণ হইয়া কর্দ্দমময় বালুকারাশি ভূগর্ভ হইতে উদ্গীর্ণ হইয়াছিল।

এমনি কোমলে ভীষণে, করুণে কঠোরে, চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সর্ব্বাংশে অতুলনীয়। এজন্য এ দেশ ভক্ত, প্রেমিক ও কবির বড়ই প্রিয়।

ভারতীয় পশু—(১)।

আমাদের দেশে অনেক প্রকার পশু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ তৃণভোজী ও মাংসাশী, এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে গরু, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি পশু আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনে আসিয়া থাকে। গোজাতির মত আর কোন পশু আমাদের এত উপকারী নহে। এ জন্য প্রাচীনতন্ত্রের উদারচেতা হিন্দুগণ গোজাতিকে দেবী ভগবতীরূপে জ্ঞান করিতে ও তদনুযায়ী শ্রদ্ধা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। তাঁহারা গো-সেবা একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া বিবেচনা করেন।

মাংসাশী জন্তুদিগের ভিতরে বিড়ালের বংশ-গৌরব সর্ব্ব প্রধান। সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শ্বাপদগুলি সমস্তই বিড়াল জাতীয়। ইহাদের আকারে প্রকারে, আহারে বিহারে, অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। অবশ্য সিংহ ব্যাঘ্রাদির তুলনায় বিড়াল দেখিতে খুবই ছোট।

বিড়ালজাতীয় জন্তুদের আকৃতি সাধারণতঃ বড় সুন্দর, ইহাদের চালচলনের ভিতরেও একটী বিশেষ পারিপাট্য আছে। ইহারা অতিশয় মাংস-প্রিয় ও শিকার-নিপুণ। ইহাদের চোখের তারা গোল, উহা আলোকের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত দিনে ছোট রাত্রে বড় হয়। ইহাদের পায়ে থাবা আছে। শিকারী চিতাবাঘ

ভিন্ন ইহাদের আর সকলেরই পায়ের নখ স্বাভাবিক অবস্থায় সেই সুকোমল থাবার ভিতরে লুকান থাকে, উত্তেজিত হইলে সর্ব্ব শরীর ফুলিয়া উঠে ও তীক্ষ্ণ নখগুলি থাবা হইতে বাহির হইয়া পড়ে।

সিংহকে পশুরাজ বলা হয়। বোধ হয়, তাহার ভীষণ মূর্ত্তি, গুরুগম্ভীর গর্জ্জন, অপরিসীম শক্তি ও সাহসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মানুষ তাহাকে এই উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছে। সিংহ সাধারণতঃ সাড়ে ছয় হাত লম্বা এবং আড়াই হাত উচ্চ হইয়া থাকে। সিংহী আকারে ইহাপেক্ষা কিছু ছোট এবং সিংহের ন্যায় তাহার ঘাড়ে কেশর থাকে না।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সিংহ পাওয়া যাইত। এখন শুধু গুজরাট ও রাজপুতানায় সিংহ পাওয়া যায়। ভারতে সিংহের বংশ ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। আফ্রিকার সিংহ সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

পশুরাজ সিংহের উদারতা ও করুণার একটা সত্য ঘটনা লিখিতেছি। একবার লণ্ডনের পশুশালায় কোন দর্শক তামাসা দেখিবার জন্য সিংহের খাঁচার মধ্যে একটী কুকুর ফেলিয়া দিয়াছিল। সেই নিষ্ঠুর লোকটী ভাবিয়াছিল, কুকুরটী পাওয়া মাত্রই সিংহ তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আহার করিবে এবং সে তামাসা দেখিবে। কুকুরটী সিংহকে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সিংহ সম্মুখে এমন খাদ্য পাইয়াও স্পর্শ করিল না। তখন নির্দ্দয় দর্শক তাহাকে উত্তেজিত ও প্রলুব্ধ করিবার জন্য এক টুকরা মাংস তাহার কাছে ফেলিয়া দিল। সিংহ তাহাও স্পর্শ করিল না। এদিকে কুকুরটী যখন দেখিল, সিংহ

তাহার কোন অপকার করিতেছে না, তখন সে সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে সেই মাংসের টুকরার কাছে অগ্রসর হইয়া আহার করিতে লাগিল। তারপর সিংহও আসিয়া কুকুরের সহিত আহারে যোগ দিল। এই হইতে সিংহ ও কুকুরের মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মিয়া গেল। তাহারা পরস্পরের গা চাটিয়া আদর করিত। কেহ কখনও কুকুরটীর নিকটে গেলে কিংবা তাহাকে সরাইতে চাহিলে সিংহটী ভয়ানক ক্ষেপিয়া যাইত। পরিশেষে একদিন কুকুরের মৃত্যু হইলে সিংহও তাহার শোকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। মানুষের ভিতরেও এমন আশ্চর্য্য ভালবাসা একান্ত দুর্ল্ভ।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুন্দরবনই ব্যাঘ্রের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। বাঘ লম্বায় সিংহ অপেক্ষাও বড় হইয়া থাকে, শক্তি সামর্থ্যেও সে পশুরাজের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে। তবে প্রকৃতি রাণী সিংহকে যে কেশরের মুকুট পরাইয়া দিয়াছেন সে গৌরব ব্যাঘ্রের নাই।

বাঘের গায়ের হল্‌দে লোমের উপর কাল রঙ্গের ডোরা কাটা দেখিতে বড় সুন্দর। সাদা ও কাল রঙ্গের বাঘ খুবই কম দেখা যায়। মেজর বরিণসন নামক একজন সাহেব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুনা নগরের নিকট একটা সাদা বাঘ ধরিয়াছিলেন। বক্‌লণ্ড সাহেব চট্টগ্রামের নিকটে একটী কাল বাঘ দেখিয়াছিলেন। ইহার গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল।

বাঘের প্রকৃতি সাধারণতঃ বড় হিংস্র। বাঘিনীর যখন ছানা হয়, তখন তাহার প্রকৃতি আরও হিংস্র হয়, তখন সে

একেবারে সর্ব্বনাশিনী মূর্ত্তি ধারণ করে। শাবকদের বিপদ আশঙ্কা করিয়া সে তখন যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই বিনাশ করিয়া থাকে।

বাঘ বেশ সাঁতার কাটিতে পারে, গাছে চড়াও তাহার কতকটা অভ্যাস আছে। এমনও শোনা গিয়াছে যে, সুন্দর বনে মাঝিরা বাঘের ভয়ে কূলের নিকটে নৌকা নঙ্গর না করিয়া মাঝ নদীতে করিলেও বাঘ তীর হইতে সাঁতরাইয়া গিয়া সেই নৌকায় উঠে এবং মানুষ মারিয়া মুখে করিয়া লইয়া যায়। বাঘ কোন কোন সময়ে গাছে উঠিয়া শিকারীকে তাড়া দিতেও দেখা গিয়াছে।

গুরুতর বিপদে পড়িলে বাঘের এই দুর্দ্দমনীয় হিংস্র স্বভাবও যেন কিছু নিষ্প্রভ হইয়া যায়। একবার এক প্রবল বন্যার সময় একটী বালকের সহিত একই কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করিয়া একটী বাঘ বার ঘণ্টা ভাসমান ছিল। উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া থাকিলেও বাঘ বালকটীর কোন অনিষ্ট করে নাই।

বাঘ নানা প্রকারে শিকার করা হয়। তন্মধ্যে নেপালের গুর্খারা যেরূপে বাঘ শিকার করিয়া থাকে তাহা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি অতিশয় বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচায়ক। তাহারা একখানি ভোজালী বা 'খুকরী' (খাঁড়া) লইয়া বাঘ শিকার করিতে যায় এবং বাঘ তীব্র বেগে লম্ফ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলেই তাহারা সুতীক্ষ্ণ ভোজালীর এক প্রচণ্ড আঘাতে বাঘের থাবা কিংবা মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। বন্দুকের গুলি করিয়া বাঘ মারা অপেক্ষা ইহাতে

শারীরিক ও মানসিক শক্তির কত বেশী প্রয়োজন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

চিতাবাঘের গায়ে ডোরা নাই, তৎপরিবর্ত্তে কাল কাল চক্র আছে। স্থানভেদে এই চক্রের কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ভারতবর্ষের চিতাবাঘের চর্ম্মে চক্র যেরূপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার চিতাবাঘের চক্র সেরূপ নহে।

বাঘ অপেক্ষা চিতাবাঘ আকারে অনেক ছোট, বলবিক্রমেও সেই তুলনায় অনেক কম। তবে ইহারা বড় বাঘ অপেক্ষা অনেক চতুর; লাফাইতে ও গাছে চড়িতে বিশেষ পটু। চিতা বাঘ নির্জ্জন খালের ধারে দাঁড়াইয়া থাবা মারিয়া স্রোতের মাছ ধরে। ইহারা বেশ পোষ মানিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের অনেক রাজা পোষা চিতাবাঘ দ্বারা হরিণ শিকার করেন। হরিণ সচরাচর দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়, ইহারা শিকারী দেখিলে এমন দ্রুত পলায়ন করে যে, বন্দুক দিয়া শিকার করা সহজ নহে। সাধারণ লোককে দেখিলে হরিণ ততটা ভয় পায় না। শিকারীরা গরুর গাড়ীতে করিয়া পোষা চিতাবাঘ লইয়া গিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিচরণশীল হরিণদলের নিকটে ছাড়িয়া দেয়, সে তখন বেগে ছুটিয়া গিয়া দলস্থ কোন একটী হরিণের টুঁটি কামড়াইয়া ধরে এবং যতক্ষণ শিকারী আসিয়া না পৌঁছায় ততক্ষণ তাহাকে ছাড়ে না।

উপরে বিড়ালের তিনটী প্রধান জাতির কথা লিখিয়াছি, এবার বিড়ালের কথা কিছু লিখিতেছি। বিড়াল দুই রকম—গৃহপালিত ও বন্য। বন্য বিড়ালগুলি ব্যাঘ্রাদির ন্যায় রক্ত-

পিপাসু ও হিংস্র। ইহারা বনে পাখী, খরগোস, হরিণের ছানা প্রভৃতি আহার করিয়া থাকে এবং সুবিধা পাইলে গৃহস্থের ছাগল মেষ, মুরগী প্রভৃতি চুরি করে। সময়ে সময়ে ইহারা মানুষকেও আক্রমণ করিতে ভীত হয় না।

গৃহপালিত বিড়াল ইন্দুর তেলাপোকা ইত্যাদি শিকার করিয়া গৃহস্থের অনেক উপকার করে। বিড়ালীর মাতৃস্নেহ অত্যন্ত প্রবল। তাহারা সন্তানের জন্য নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। অনেক সময়ে এমনও দেখা গিয়াছে বিড়ালী আপনার ছানা হারাইয়া কুকুর, কাঠবিড়ালী ও মুরগীর ছানা পুষিয়াছে।

বিড়াল নিজের প্রভুর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারে, প্রভু ডাকিলে সে মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসে এবং প্রভুকে আদর করে ও তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া একটু আদর পাইতে চায়। কখনও কখনও এত বুদ্ধির পরিচয় দেয় যে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

কোনও গৃহস্থের একটী বিড়াল ও একটী ময়না ছিল। ইহারা পরস্পরকে খুব ভালবাসিত। একদিন উভয়ে খেলা করিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ বিড়ালটী ময়নাটীকে মুখে লইয়া দৌড়িয়া পলাইল। সকলেই মনে করিলেন, বিড়ালটী আজ আর তাহার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। কিন্তু পরে দেখা গেল, আর একটী বিড়াল সেখানে উপস্থিত হইয়াছে; সেই বিড়ালটী চলিয়া গেলে তখন পূর্ব্বোক্ত বিড়ালটী ময়নাটীকে তেমনি ভাবে মুখে করিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল; ময়নাটীর

গায়ে একটী সামান্য আঁচড়ও লাগে নাই। তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন, ময়নাটীর কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা করিয়াই বিড়াল তাহাকে লইয়া পলাইয়াছিল।

একটী বিড়াল একটী অন্ধ কুকুরকে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইত। আর একটী বিড়াল অপর একটী অন্ধ বিড়ালকে আহার যোগাইত। বিড়ালের মনে যে কতটা করুণার ভাব আছে, এই দুইটী ঘটনায় আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

বিড়ালের অভিমান ও আব্‌দারও বড় সামান্য নয়। আমাদের একটী কাবুলী বিড়াল আমাকে বড় ভালবাসে, আমাকে দেখিলেই সে আমার কাছে ছুটিয়া আসে এবং প্রায় সমস্ত দিনরাতই আমার সঙ্গে কাটায়। আমি যখন একেলা বসিয়া লেখাপড়া করি, তখন সে আমার কাছে আসিলে আমি যদি তখনই তাহাকে আদর না করি, তবে সে ধীরে ধীরে চলিয়া যায়, আমি পরে হাজার ডাকাডাকি করিলেও আর সে ফিরিয়া আসে না—একবার ফিরিয়াও চায় না! তাহার এমনি দুর্জ্জয় অভিমান!

আবার কখনও কখনও এই বিড়ালটী আমার লেখাপড়ার সময় প্রথমেই আমার আদরের অপেক্ষা না করিয়া, আমার পায়ের চারি পাশে মাথা ও লেজ লাগাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, আমি কিছু না বলিলে এক লাফে আমার কোলে উঠিয়া বসে এবং আমার মুখে তাহার মুখ লাগায়। আমি যদি তখনও তাহাকে কিছু না বলি, তবে আর এক লাফে আমার মেজের উপরে চড়িয়া বসে এবং আমি লিখিতে থাকিলে আমার কলম

ধরিয়া নাড়াচাড়ি আরম্ভ করিয়া দেয়; তাহাতেও আমি কিছু না বলিলে, বেশ গম্ভীর ভাবে আমার সম্মুখের পুস্তক বা কাগজের উপর উঠিয়া শুইয়া পড়ে এবং যেন বেশ একটু কৌতুকের সহিত আমার মুখের পানে তাকায়! এইরূপে সে জোর করিয়া আমার আদর আদায় করিয়া লয়!

ভারতীয় পশু—(২)।

ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগকে বিড়ালজাতীয় পশুর কথা বলিয়াছি, আজ কুকুর ও ভালুকবংশের বিষয় কিছু বলিব।

নেকেড়ে বাঘ, শিয়াল ও খেঁকশিয়াল প্রভৃতি কুকুরবংশের অন্তর্গত। ইহাদের শরীর ও মুখের আকৃতি, দাঁতের সংস্থান এবং শিকার ধরিবার প্রণালীতে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাদের ঘ্রাণশক্তিও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

পৃথিবীতে প্রায় ১৮৫ প্রকারের কুকুর দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশই মানুষের খুব পোষ মানে। কুকুরের মত এমন বিশ্বাসী ও প্রভুভক্তিপরায়ণ পশু আর নাই। ইহারা চোরের পরম শত্রু। কোন গৃহস্থের গৃহে একটী ভাল কুকুর থাকিলে চোর আর সে বাড়ীর ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে সাহস পায় না।

হিমালয় প্রভৃতি ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে এক প্রকার বন্য কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শরীরের গঠন অনেকটা শিয়ালের মত এবং গায়ের রং সাধারণতঃ গাঢ় মেটে

হইয়া থাকে। এই পাহাড়ী কুকুরকে হিমালয় অঞ্চলে ভুনসা বা বুয়ানশু, দাক্ষিণাত্যে কলশুন, এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বনকুত্তা, সোণাকুত্তা বা রামকুত্তা বলা হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে কুকুর সচরাচর গৃহরক্ষকের কার্য্যেই নিযুক্ত হয়। কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন জাতীয় কুকুর যথারীতি শিক্ষিত হইয়া নানা বিষয়ে মানুষের মহৎ উপকার সাধন করে। এস্কিমোজাতীয় কুকুরগুলি গ্রীণলণ্ড, সাইবিরিয়া ও কামস্কটকার অধিবাসীগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন। সেণ্টবার্ণার্ড নামক কুকুরগুলি ইউরোপের আল্‌পস্ পর্ব্বতশ্রেণীর বিপন্ন পথিকগণের পরম সুহৃদ্। ফ্রান্সদেশে কুকুরকে পুলিসের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে।

মধ্যভারত, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও বিহার প্রদেশ নেকড়ে বাঘের প্রধান বাসস্থান। বঙ্গদেশে ইহা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। নেকড়ে বাঘ স্বভাবতঃ ভীরু; কিন্তু ক্ষুধিত হইলে কিংবা দলবদ্ধ থাকিলে ইহারা অতিশয় সাহসী ও হিংস্র হয়। ইহারা শিকারকে দৌড়াইয়া পরিশ্রান্ত করিয়া তারপর তাহাকে আক্রমণ করে; বিড়ালজাতীয় পশুর ন্যায় হঠাৎ লাফ দিয়া শিকার ধরে না। একান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন কোন নেকড়ে বাঘকে নরশিশু চুরি করিয়া লইয়া গিয়া প্রতিপালন করিতে দেখা গিয়াছে। যেখানে খাদ্য ও খাদকের সম্বন্ধ, সেখানে এরূপ বাৎসল্য ও অনুরাগ বড়ই বিচিত্র ব্যাপার সন্দেহ নাই।

যাবতীয় পশুর মধ্যে শিয়াল চাতুরীতে শ্রেষ্ঠ। ইহাদের চতুরতা সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। যখন ইহারা

ধরা পড়ে, তখন মৃতের মত এমন ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকে যে, সহস্র আঘাতেও একটুকু সাড়াশব্দ করে না ; তারপর যথার্থ মৃতবোধে তাহাদিগকে ফেলিয়া দিলে, উঠিয়া দ্রুত পলায়ন করে।

শৃগাল সকল প্রকার মৃত প্রাণীর গলিত দুর্গন্ধ মাংস আহার করিতে অত্যন্ত ভালবাসে . এজন্য ইহাদের দ্বারা পল্লীগ্রামের পূতিগন্ধময় জঞ্জালরাশি পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। মানুষ এ বিষয়ে তাহাদের নিকটে বিশেষ ঋণী।

শিয়াল অপেক্ষা খেঁকশিয়াল আকারে ছোট। ভারতবর্ষে তিন চার রকমের খেঁকশিয়াল দেখা যায়। ইহাদের এক এক বারে তিন চারটী করিয়া ছানা হয়। ইহাদের ছয়টী মাত্র স্তন, কুকুর ও শিয়ালের ন্যায় দশটী স্তন থাকে না। ইহারা যে গর্ত্তে শাবকদের লইয়া বাস করে, তাহাতে নানাদিকে সুড়ঙ্গ করিয়া নানা স্থানে বহু দূরে দূরে অনেকগুলি মুখ প্রস্তুত করে। কোন শত্রু তাহাদের গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া আক্রমণ করিতে গেলে, তাহারা অন্য সুড়ঙ্গ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পলাইয়া যায়।

ভারতবর্ষে সাধারণতঃ দুই রকমের ভালুক দেখা যায়। ইহাদের এক দল হিমালয় প্রদেশে এবং অন্য দল গারো পর্ব্বত, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে বাস করে। হিমালয় অঞ্চলের ভালুকের গায়ের রং কাল এবং ইহাদের বুকের উপর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটী সাদা রেখা আছে। ইহারা অন্য শ্রেণীর ভালুক অপেক্ষা অধিক মাংসাশী, হিংস্র এবং দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। ইহারা সন্তরণে এবং বৃক্ষারোহণেও বিশেষ পটু।

সুতরাং এই ভালুকের হাত হইতে শিকারের রক্ষা পাওয়া একরূপ অসম্ভব।

গারো পর্ব্বতাদির ভালুক আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট, ইহাদের বুকের হাঁসুলি হরিদ্রা ও নারাঙ্গি বর্ণেরও হইয়া থাকে। ইহারা ফলমূল খাইতে বেশী ভালবাসে, মধু ইহাদিগের অতিশয় প্রিয়। ইহারা অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়াইতে পারে।

ভালুক সময়ে সময়ে আশ্চর্য্য বুদ্ধির পরিচয় দেয়। একবার মহারাজ সূর্য্যকান্ত কোন বনে পাখী শিকার করিতে যাইয়া ভালুকের হাতে পড়েন। তাঁহার নিকটে তখন পাখী মারিবার ছররাগুলি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার গুলি ছিল না, সেই ছররাগুলিও প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। কাজেই তিনি বাধ্য হইয়া নিকটস্থ একটী গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভালুকও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া গুহাদ্বারে উপস্থিত হয়। সৌভাগ্যবশতঃ গুহার মধ্যে কতকগুলি শুষ্ক খড় ছিল, তিনি সেগুলি গুহাদ্বারে প্রজ্বলিত করিয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। দুর্দ্দান্ত ভালুক সেই আগুনের জন্য গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। অবশেষে সে নিকটবর্ত্তী স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করিয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া আসিল এবং আগুণের নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার দীর্ঘ লোমগুলি বারংবার ঝাড়িয়া জলকণাদ্বারা আগুণ নিভাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। একবারে কৃতকার্য্য না হওয়ায়, এ ভাবে সে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিল।

এদিকে শুষ্ক তৃণপুঞ্জ ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। তখন

মহারাজ একান্ত নিরুপায় হইয়া তাঁহার শেষ সম্বল ছররাগুলি দুইটী ভালুকের চক্ষু লক্ষ্য করিয়া মারিলেন। তিনি লক্ষ্যভেদে সর্ব্বদা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আজও তাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। মুহূর্ত্তে ভালুক অন্ধ হইয়া করুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গভীর অরণ্যে পলায়ন করিল। ভগবৎ কৃপায় মহারাজ রক্ষা পাইলেন।

(পদ্যাংশ ।)

প্রার্থনা ।

আমার জীবন কর উষার মতন
        শান্ত সুশীতল,—
সতত দীনের যেন পারি মুছাইতে
        তপ্ত আঁখি-জল !
হৃদয় মাঝারে তুমি থাকিও দেবতা,
        অরুণের কিরণের মত,
নিরাশতা অলসতা দূরে যাবে মোর,
        দিশে দিশে হবে আলোকিত !

আমার জীবন কর মলয়ের মত
        মৃদুল মধুর,—
সদা যেন ব্যথিতের পারি করিবারে
        শত ব্যথা দূর !
হৃদয় মাঝারে তুমি থাকিও দেবতা,
        মলয়ের মাধুরীর মত,
পাপ তাপ মলিনতা দূরে যাবে মোর,
        পুণ্য-বাসে হবে আমোদিত !

আমার জীবন কর হিমাদ্রির মত
গম্ভীর অটল,—
রোগ-শোক-দুখ যেন নাহি পারে কভু
করিতে চঞ্চল!
হৃদয় মাঝারে তুমি থাকিও দেবতা,
হিমাদ্রির জাহ্নবীর মত,
দয়া-প্রেম-প্রীতিরাশি স্নিগ্ধ স্নেহ-রসে
নিশিদিন হবে সঞ্জীবিত!

জীবন আমার কর আকাশের মত
বিরাট মহান্,—
নীরবে অনন্তকাল যেন পারি তোমা
করিতে ধেয়ান!
হৃদয় মাঝারে তুমি থাকিও দেবতা,
আকাশের তপনের মত,
অজ্ঞান-তিমিররাশি পলকে বিনাশি
দিকে দিকে হবে উদ্ভাসিত!

———

হাসি।

১

বিশ্ব-অবনী দিবস-রজনী
নীরব মধুর স্বরে,
যেন অবিরত হরষেতে কত
হাসিছে পরাণ ভরে!
হাসে রবি-শশী পুলকে মাতিয়া,
সে হাসির ঢেউ ভূলোক ভাসিয়া
দিবসে নিশায় বেড়ায় নাচিয়া
যেন গো কাহার তরে!
বিশ্ব-অবনী দিবস-রজনী
হাসিছে পরাণ ভরে!

২

কনক চপলা হাসে গো উতলা
নিবিড় জলদ 'পরে;
শিশুগুলি হাসে জননীর পাশে,
মনের বেদনা হরে!
হাসে গো তটিনী জ্যোছনা মাখিয়া,
সে হাসির মাঝে বিরলে ফুটিয়া
হাসে গো নলিনী চাঁদিমা হেরিয়া
সারাটী যামিনী ধরে!
বিশ্ব-অবনী দিবস-রজনী
হাসিছে পরাণ ভরে!

৩

হাসে তরু-লতা শুনি কার কথা—
সবুজ বসন প'রে,
হাসে ফুল-ফল মোহি ধরাতল
কানন উজল ক'রে!
হাসে গো তারকা গগনে থাকিয়া,
সে হাসির রেখা পড়ে গো আসিয়া
আঁধার রাতির কালিমা নাশিয়া
বিশাল বসুধা 'পরে!
বিশ্ব-অবনী দিবস-রজনী
হাসিছে পরাণ ভরে!

৪

হাসে নরনারী দিবা-বিভাবরী
আকুল হরষ ভরে;—
হাসিছে সাগর হাসিছে নির্ঝর
হেথা হোথা থরে থরে!
যেদিকে নিরখি দেখিবারে পাই
সকলি হাসিছে—আমরাও ভাই,
বিমল পুলকে এস হেসে যাই
সারাটী জীবন ধরে!
বিশ্ব-অবনী দিবস-রজনী
হাসিছে পরাণ ভরে!

প্রভাত।

নিশার আঁধার ধীরে ঘুচে গেল, এল ফিরে
প্রভাত আবার,—
উদিল তরুণ রবি, নদী-জলে রাঙ্গা-ছবি
ভাসে চমৎকার!
মধুমাখা স্নিগ্ধ স্বরে, প্রভাতে আরতি করে
ফুল্ল বিহঙ্গম;
নন্দন-সুষমা ঢালি ফুটিয়াছে ফুল-কলি
গন্ধে অনুপম!
মৃদুমন্দ সমীরণ কাঁপায়ে ফুলের বন
ধীরে ধীরে বয়;
জাগিয়াছে সুপ্ত ধরা নব শক্তি আশা ভরা
সারাটী হৃদয়!
অদূরে মন্দির মাঝে প্রভাত আরতি বাজে
পূর্ণ কোলাহল!
মধুর সময়ে হেন জড়প্রায় রবে কেন
আলস্যে কেবল?
যাঁর দান এ প্রভাত এস সবে প্রণিপাত
করি পদে তাঁর;—
নব আশা নব বলে রত হই কুতূহলে
কার্য্যে আপনার!

আমাদের কাজ।

ছোট যে আমরা কি কাজ মোদের
পারি না বুঝিতে ভাই,
বড় যবে হব কত কি করিব
তাহার ঠিকানা নাই !
তবু প্রাণে মোর কে যেন কহিছে
কোমল মধুর স্বরে,—
"যদিও তোমরা ছোট অতিশয়
তবুও অমন ক'রে,
অলসের মত সময় কাটাতে
আসনি অবনী 'পরে ;
করে যাও কাজ যেটুকু শকতি
সারাটী জীবন ধরে !
ব্যথিতের আঁখি দাও গো মুছায়ে,
ক্ষুধিতে আহার দাও,
অনাথ যাহারা তা'দের আদরে
গৃহেতে ডাকিয়া নাও !
জনক-জননী ভাই ও ভগিনী
সবারে বাসিও ভাল ;
অলীক-বচন কহিয়ে কখন
জীবন করো না কাল !

সুকুমার মতি ছোট ছোট অতি
তোমরা যেমন সবে,
তেমতি সবার ছোট ছোট কাজ
পালন করিতে হবে।
যে জন সবায় আনিল হেথায়
তাঁর পদে সদা আর,
মাগিও শকতি করিবারে কাজ
মনের মতন তাঁর!"

প্রভুর করম সাধিতে।

হে মলয় বায়ু! দাঁড়াও একটু!
কোথা যাও তুমি বহিতে?—
কাননে কাননে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
কুসুম-রেণুকা নিতেছি মাগিয়া
প্রভুর করম সাধিতে!—
পারি না যে ভাই দাঁড়াতে!

হে নদীর ঢেউ! দাঁড়াও একটু!
কোথা যাও তুমি ত্বরিতে?
মধুর রাগিনী গাহিয়া গাহিয়া
দিবানিশি আমি চলেছি ধাইয়া
প্রভুর করম সাধিতে!
পারি না যে ভাই দাঁড়াতে!

হে জলদরাশি! দাঁড়াও একটু!
কোথা যাও তুমি ভাসাতে?
নিদাঘ তাপিত ধরণী ভরিয়া
শীতল সলিল যেতেছি ঢালিয়া
প্রভুর করম সাধিতে!
পারি না যে ভাই, দাঁড়াতে!

হে প্রভাত-পাখি! দাঁড়াও একটু!
কোথা যাও তুমি গাহিতে?—
ঊষার আরতি সুতানে গাহিয়া
চলিয়াছি আমি পুলকে মাতিয়া
প্রভুর করম সাধিতে!—
পারি না যে ভাই দাঁড়াতে.!

তাইতো!
চলিয়াছে সবে আকুল হইয়া
প্রভুর করম সাধিতে!
আমরাও যাই—এস ত্বরা করি—
তাঁহার চরণ সেবিতে!

প্রকৃতি।

প্রকৃতি, জগত-রাণী, জননী আমার!
আজি আমি ভাবিতেছি পুলকে অপার

এত হাসি, এত গান, এত শোভারাশি,
কে তোমা করেছে দান সুখে ভালবাসি' !
রবি-শশী-তারকার মহামেলা নিতি
তোমার উদার নভে বসে দিবা-রাতি ;—
জননী, তোমার বুকে স্নেহ-ধারা সম
তটিনী-সাগর কত বহে নিরুপম।
ফুলে ফুলে ছেয়ে রয় তোমারি কানন,
কি কথা জানায়ে ধায় মৃদু সমীরণ,
পাখী গায় হরষে কি ললিত রাগিনী—
ষড় ঋতু আসে যায় মাতায়ে ধরণী !
তোমার আঁচল-ছায়ে, সাধ যায় মোর,
আপনা ভুলি মা, সদা ঘুমে রহি ভোর !

বর্ষা।

নিদাঘ-শেষে মোদের দেশে
এল কে,
আকাশ ভরা মেঘের মেলা,
অস্ত রবি-শশীর খেলা,
দুপুর যেন সন্ধ্যা বেলা
কুহকে।

মেঘের কোলে বজ্র-রবে
কাহার হাসি জাগায় সবে
সোনার ঢেউ বিশাল ভবে
ঝলকে !
নিদাঘ-শেষে এমন বেশে
এল কে !

বিরাম-হারা সুধার ধারা
ঝরিছে !—
শুষ্ক নদী পূর্ণ নীরে
উথলে ঢেউ উভয় তীরে
ধোয়াতে কার চরণ কি রে
খুঁজিছে !
শূন্য ক্ষেতে চাষীর শ্রমে
হাসেন বুঝি বিশ্ব-রমে
পাগল বায়ু আঁচল চুমে
ছুটিছে !
বিরাম-হারা সুধার ধারা
ঝরিছে !

শিখীর দলে পেখম খুলে
নাচিছে !

কেওয়া ফুলে কদম ফুলে
হাসিছে ওই ঘোম্‌টা খুলে
সুধা-গন্ধ লহর তুলে
মাতিছে।
আজিকে মোরে সবার সনে
ডাকিছে কেবা ক্ষণে ক্ষণে
কাহার কথা শুধুই মনে
পড়িছে!
শিখীর দলে পেখম খুলে
নাচিছে!

বিশ্ব-রাজ! তুমি কি আজ
আসিলে!
নিদাঘ-দগ্ধ ধরাটীরে
সাজিয়ে দিতে স্নেহ-নীরে
বর্ষারূপে আপনি কিরে
সাজিলে!
তোমার পূজা এবার তবে
পরাণ ভরে করব সবে—
প্রেমের ডোরে নিখিল ভবে
বাঁধিলে!
বিশ্ব-রাজ! তুমি কি আজ
আসিলে!

শরতে প্রকৃতির হাসি।

কত কাল পরে আজি থেমে গেছে বারি-ধারা
প্রকৃতি হাসিছে মরি! পুলকে আপনা-হারা!
তরু-লতা-কিশলয় কি বিমল! কি উজল!
তরুণ রবির কর করে তায় ঝলমল!

নিবিড় নীরদ ঢাকা অসীম আকাশ খানি
আজিকে সুনীল কত! বহে কি হরষ-বাণী!
পাখীরা ত এতদিন গিয়েছিল গান ভুলে—
আজ সবে গায় সুখে কেমন পরাণ খুলে!

কি মধুর সমীরণ! শিহরে অবশ মন!
শিহরে শ্যামল তৃণ লভি সুধা-পরশন!
চারি ধারে ঝরে আশা—খেলে নব জাগরণ!
উথলে ভুবন ভরি কি সুষমা অতুলন!

পূজা।

তরুলতা ফুলে ফলে
আজি নব জাগরণ,
শারদীয়া জননীরে
করে নিতে আবাহন!

সুনীল গগন-কোলে
রবি-শশী তারা হাসে,
পুলকে বিহগ গায়
সমীর ধাইয়া আসে !

তটিনীর কল-তানে
সোনার লহর জাগে,
সকলে পূজিতে মায়
যেতে চায় যেন আগে !

সবাকার সাথে আজি
আমিও পূজিব মা'রে,
সবাকার সাথে তাই
এসেছি পূজিতে তাঁ'রে !

মাতৃ-রূপ

জননী আমার, আজিকে তোমায়
হেরি কি বেশে—
মধু শরতের মধুরিমাময়
দিবস শেষে !
মাঠে মাঠে তোর ফলেছে মা সোনা
সান্ধ্য-সমীর করে আনাগোনা
লহর তুলি' !

ফিরিছে কৃষাণ কাঁধে লয়ে হাল
আগে ভাগে মাগো ধায় ধেণুপাল
উড়ায়ে ধূলি !

মা তোর আকাশে কে যেন দিতেছে
সিঁদুর গুলে' ;
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ঘরে ফিরে যায়
সুতান তুলে' !
ভরা-নদী ধরি মরমের গান
সাগরের পানে করিছে পয়াণ
হর্ষ ভরে !
ফুলরাশি হোথা চয়ি বন-বালা
গাঁথিয়া রাখিছে মনোরম মালা
কাহার তরে !

পবিত্র করি সরসীর নীর
পল্লী-বধূ
গাহন করিছে পুলকিত মনে
বিকায়ে মধু !
ঘাটে দাঁড়াইয়ে দেব-শিশুকুল
দেয় করতালি অতুল অতুল
জননী অয়ি !

ঘরে ঘরে আর তুলসীতলায়
সন্ধ্যার দীপ কেবা জ্বেলে যায়,
করুণাময়ি !

সান্ধ্য-তারকা হাসিছে গগনে
জাগিয়া ধীরে,
দিতেছে ভিজায়ে নবীন শিশির
বসুধাটীরে !
নীরব পল্লী মুখর করিয়া
মন্দিরে উঠে রহিয়া রহিয়া
আরতি-রোল !
ধূপ-চন্দন-গহন-গন্ধে
দেবতা-মানব-মানস নন্দে
ভুলায়ে গোল।

সবাকার মাঝে সবাকার সাথে
জননী, আজ
একি অপরূপ করিলে আ মরি !
মোহন সাজ !
কল্যাণ নব তব চারিধারে
ঝরিয়া পড়িছে মরু-সংসারে
আকুল সুখে !

বিশ্বের হরি' ভাবনা-বেদনা
আজ যেন মাগো নিয়েছ চেতনা
সবার বুকে !

যীশু ও শিশু।

একদা মহাত্মা যীশু প্রিয় শিষ্যগণে
দিতেছেন বিশ্ব-পতি পিতার সন্দেশ,
নির্ব্বাক নিস্পন্দ সবে, হর্ষ-মুগ্ধ মনে
করিতেছে অনুভব অপূর্ব্ব আবেশ।

অকস্মাৎ একজন শুধাইলা তাঁরে,
"কহ প্রভু, স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন ?"
উৎসুক সবার চিত্ত ক্ষণিক মাঝারে
শুনিতে কহেন কিবা মনুষ্য-রতন !

প্রসন্ন আনন-কোণে ফুটে উঠে হাসি—
সরোজে পড়িল যেন জ্যোছনা কিরণ—
হেন কালে শিশু এক দিব্যশোভারাশি
নিকটে আসিতে তাঁর করে আকিঞ্চন !

নিবারিল সবে তারে, যীশু প্রেমময়
কহিলেন "দাও তারে আসিতে হেথায়,
সত্য করি তোমা সবে কহিনু নিশ্চয়
স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যেবা শিশু প্রায় !

"তোমরা যদ্যপি নহ শিশুর মতন
স্বর্গরাজ্যে কোন দিন নারিবে পশিতে ;—
মোর নামে শিশুরে যে করেন গ্রহণ
আমারেই বক্ষ পাতি লয়েন চকিতে !"

মহত্ত্ব।

সপার্ষদ নৃপমণি বাহিরিলা পথে,
উঠে ঘন জয়-ধ্বনি আকাশে গভীর,—
স্থবির ভিক্ষুক এক আসি কোথা হতে
নরেন্দ্রে প্রণাম করে নোয়াইয়া শির।
চকিতে থামায়ে অশ্ব নামিয়া ত্বরায়
ভিখারীর পদে নমে রাজ-রাজেশ্বর,—
স্তম্ভিত বিস্মিত সবে চিত্রপট প্রায় !
শুধায় অমাত্য এক করি যোড় কর—
"মহারাজ ! সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-পতি তুমি,
নগণ্য কাঙ্গালে কেন করিলে বন্দনা ?"
উত্তরিলা মহামতি (স্বর্গ-মর্ত্ত্য চুমি'
পলকে খেলিল যেন ত্রিদিব-মূর্চ্ছনা !)—
"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমি মন্ত্রী, সত্য বটে তাই,—
কেন বা বিনয়ে বড় হবে ভিক্ষু, ভাই !"

বৎস-হারা ধেনু।

ঝর ঝর ঝর ঝর
ঝরে পড়ে বারি-ধারা,
পাগল গাভীটী আজ
হইয়ে বাছুর-হারা !
কখন দাঁড়ায় আসি'
মৃত বাছুরের কাছে,
ভাবে বুঝি বাছা তার
নীরবে ঘুমায়ে আছে !
তাই কত স্নেহ-ভরে
চাটে তার হিম-দেহ,
শিং উচাইয়া ধায়
নিকটে আসিলে কেহ !
একটুকু দূরে সরি'
কভু চাহি তার পানে,
সকরুণ 'হাম্বা' রবে
কাতরতা কিবা আনে !
হায়রে আগের মত
নাচিয়া ছুটিয়া সুখে,
কে আজ আসিবে আর
দুধ খেতে তার বুকে !

বাছুরের কাছে আসে
ঘুরে ফিরে আরবার,
কত মতে চাহে শুধু
টুটিবারে ঘুম তার!
অবোধ বনের পশু
কেমনে বুঝিবে হায়,
এ মহা ঘুমের শেষ
নাহি আর এ ধরায়!
মানব-মায়ের ব্যথা
ফুটে হাহাকারে ঘোর,
সঘনে উছাসি' উঠে
বুক-ফাটা আঁখি-লোর!
গাভী-মাতা নাহি পারে
দারুণ মরমানলে,
রোদনে কি হাহাকারে
প্রকাশিতে ধরাতলে!
তবু তার মৌন-ব্যথা
মাতৃ-স্নেহ নিরুপম,
উথলে আকুল করি
মানব-মায়ের (ই) সম!
ওই যে বাছুর পাশে
বার বার ছুটে যায়,

ওই যে জাগাতে তারে
বার বার বৃথা চায়,
ওরি মাঝে কি যাতনা
কি বাৎসল্য অতুলন,
রয়েছে গোপন হায়,
বুঝিবে রে কোন্ জন ?

* * *

কতদিন কেটে গেছে
বাছুর গিয়েছে মরি'
গাভী-মাতা এখনো যে
আকুল তাহারে স্মরি' !
রাখাল তাহারে যবে
নিয়ে যায় নদী-তীরে,
বাছুর আসিছে কি না
পিছনে সে চায় ফিরে !
কচি তৃণ খেতে খেতে
বিচরিতে শ্যাম-ক্ষেতে,
কে যেন তাহারে ডাকে
দাঁড়ায় সে কান পেতে !
সহসা অধীর হয়ে
'হাম্বা' রব কভু করে,—
কি গভীর ব্যাকুলতা
জেগে উঠে সেই স্বরে !

কভুবা ক্ষেপার মত
চেয়ে দেখে চারি ধার,
হায়রে হারান-নিধি
ফিরে কি আসিছে তার !
কখনো উদাস-পারা
ছুটে কোথা অকারণে,—
বুঝিবা খুঁজিতে চায়
বাছা কি লুকান বনে !
নীরবে নিরখি আমি
ভাবি মনে অনিবার,
নর-মাতা ধেনু-মাতা
মাতৃ-স্নেহে একাকার !

ধ্রুবের ব্যাকুলতা।

নিবিড় অরণ্য, চারিদিক অন্ধকার,
বিচরিছে স্থানে স্থানে হিংস্র জন্তুগণ,
কাতরে ভকত ধ্রুব করিয়া চীৎকার
দীন-ভাবে করিছেন আত্ম-নিবেদন—

"কোথা হে কাঙ্গাল-ধন ! এস একবার
বিমাতার বাক্য-বাণে বিঁধিছে হৃদয় ;

দীন-বেশে ডাকি নাথ, করি হাহাকার,
কৃপা করে একবার হও হে সদয় !

"শুনেছি মায়ের মুখে, হে হরি সুন্দর !
দীন-জন বাঞ্ছা পূর্ণ কর দয়াময় ;
অভাগা এসেছে তাই তৃষিত অন্তর
শ্রীপদ লভিতে আর হেরিতে তোমায়।

"দীননাথ ! বিলম্বিত সহেনাক আর,
কাঁদিছে সন্তপ্ত প্রাণ দেখনা চাহিয়া ;
কৃপা করে খুলে দাও স্বর্গের দুয়ার,
চরণ-দর্শনে তব জুড়াইব হিয়া।"

কিন্তু কি আশ্চর্য্য শিশু ধ্রুবের সাধন !
জানে না হরির কিবা স্বরূপ প্রকার ;
বায়ুতে পাদপশ্রেণী করে শন্ শন্,
ধ্রুব কহে "হরি ! বুঝি আসিলে এবার।"

রাখিয়া আকাশ পানে আকুল নয়ন
আত্ম-হারা ভক্ত ধ্রুব ; মুকুতার প্রায়
ঝরিছে বিমল অশ্রু তিতিয়া বসন ;
এমন স্বর্গীয় শোভা কে দেখেছে হায় !

আহা ! কি অপূর্ব্ব প্রেম, সরল ভকতি,
কাঁপিল সে ভক্ত-স্বরে নিস্তব্ধ গগন ;

নয়নের জলে ধ্রুব করিছে মিনতি,
হেরিয়া বিদীর্ণ হয় পাষাণের মন।

নিনাদিল বন গুহা ধ্রুবের চীৎকারে,
শুনি স্বর চমকিল পশু-পক্ষীগণ ;
চমকিল নিশাচর সকরুণ স্বরে,
দাঁড়াল অনতিদূরে হিংস্র জন্তুগণ।

পঞ্চম বর্ষীয় শিশু এমন সময়
নির্ভয় অন্তরে করি সবে আলিঙ্গন,
"তোমরা কি দীননাথ হরি দয়াময়",
এরূপে অবোধ শিশু করে সম্বোধন।

ধ্রুবের বিনীত-ভিক্ষা করিয়া শ্রবণ
ব্যাকুল হইল এবে হরির হৃদয় ;
দীক্ষাদান করিবারে নারদে তখন
পাঠালেন ধ্রুব কাছে হরি দয়াময়।

ভক্ত ধ্রুব এ সময় স্তিমিত-নয়নে
গভীর সমাধিমগ্ন, পূর্ণ অচেতন ;—
বহিতেছে প্রেম-অশ্রু স্মরি' মনে মনে
পরশ-রতন হরি সন্তাপ-হরণ !

অকস্মাৎ সম্মুখেতে হেরিয়া নারদে
মহান্ তেজস্বী মূর্ত্তি গম্ভীর প্রকৃতি,

প্রণমিয়া ভক্তিভরে দেবর্ষির পদে
দাঁড়াইলা অচঞ্চল সবিস্ময়ে অতি।

শুধান দেবর্ষি ধ্রুবে হয়ে আগুসার
"প্রিয় বৎস! দীনবেশে হেথা কি কারণ?
আমি নহি তিনি, তুমি অভিলাষী যাঁর,
লভিবে কেমনে হায়, সে দুর্ল্লভ ধন?

"যুগযুগান্তর ধরি ঋষিযোগীগণ
অবিরাম করি কত তপস্যা তাঁহার
তথাপি হে বৎস, নাহি পান দরশন;
শিশু তুমি, ভাব কি হে দেখা পাবে তাঁর?

"ক্ষান্ত হও শিশু ধ্রুব! বৃথা কেন আর
ঈদৃশ কঠোর ব্রতে আগ্রহ তোমার;—
ছাড় বন, গৃহে ফিরে যাও এইবার,
বৃদ্ধ বয়সেতে হেথা আসিও আবার।"

দেবর্ষির বাক্য কিন্তু ধ্রুবের হৃদয়ে
পশিল না একবার, জ্বলিল সে হৃদে
দ্বিগুণ পিপাসানল, দ্বিগুণ প্রত্যয়ে
অটল রহিল মন শ্রীহরির পদে।

বিশ্বাস-মুকুট শিরে, ভক্তি-হার গলে,
অতুল স্বর্গীয়-বলে ধ্রুব কারে ডরে?

পর্ব্বত সমান বিঘ্ন আস্থক্ ভূতলে,
কার সাধ্য হেন শক্তি পরাজয় করে ?

কহিলেন ধ্রুব, "দেব ! করিয়াছি পণ-
যায় যাবে প্রাণ তাহে নাহি করি ভয়—
যদিও হয় সে দেব-দুর্ল্লভ চরণ,
তথাপি দর্শন আমি লভিব নিশ্চয় !"